চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা

নাটক বিশ্ব সাহিত্যের একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষায় প্রাচীনকালেই বহু সমৃদ্ধ নাটক রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। সুখের বিষয়, এই সময়েই বাংলা সাহিত্যের এই নব প্রকরণটি বেশ সমৃদ্ধ হয়। আমরা লক্ষ করব, নাট্যসাহিত্যের উদ্ভবের সময় বাঙালীর আত্ম-উন্মোচনের মনোভাবটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, নাট্যকারের বিশেষ আন্তরিকতা ও সক্রিয়তায় বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য হিসাবে উত্তরণ ঘটে বা প্রতিষ্ঠাপায়। এখানেই শেষ নয়, এই সময়ের বাংলা নাটক সমাজ-সংস্কারের কাজকে গতিদান করার চেষ্টা করেছে, জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে ও উনিশশতকেই বাংলা নাটক বাঙালীর নিজস্ব নাটক হিসাবে পরিচিত হতে চেয়েছে।

আমরা এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে যে মাত্রাগুলি সংযোজিত হয়েছে তা বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণ, সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় বাংলা নাটক সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় বাংলা নাটক রচনা, নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বাঙালী ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণ ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাটক বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাগাধুনিক যুগের সাহিত্য বলতে শুধুই কাব্য। অবশ্য প্রাক্ চৈতন্যযুগে রচিত কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নাট্য লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে নাটক বলা উচিত নয়। কালের হিসাবে হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল' (১৭৯৫) মধ্যযুগের ফসল। নাটকটি অনুবাদিত ও অভিনীত হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল'-এ আধুনিক নাটকের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে বলা যায় — ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনার অন্তত ৫-৬ বছর পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা হয়। এরপর দীর্ঘ দিন বাংলায় নাট্যচর্চা হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে শিক্ষিত সমাজে ইউরোপীয় নাট্যশিল্পের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। অনতিবিলম্বে দেশীয় শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য ইংরেজের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ

প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের প্রচলন করেন। বাংলা নাটকের গবেষক ও সমালোচকগণ এবিষয়ে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। জানা যায়, শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এরপর একে একে অনেক ধনাঢ্য নাট্যপিপাসু ব্যক্তিগণ নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা (১৮৫৭) উদ্বোধন করা হয়। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮)। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয়। চিৎপুরের রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে অভিনীত হয় বিধবাবিবাহের সমর্থনে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটক। এছাড়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে 'পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়' (১৮৬৫), শোভাবাজার রাজবাড়িতে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫) প্রভৃতি নাট্যশালা বা রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি করে তোলে। রঙ্গমঞ্চগুলির প্রয়োজনে প্রথমদিকে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত নাটকগুলির অনুবাদ অভিনীত হত। এবং নাট্যকারের নিকট ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকই আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছিল। জানা যায়, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। জি. সি. গুপ্ত ও তারাচরণ শিকদার বাংলায় যে নাট্যরচনার ধারা প্রবর্তন করলেন— তা কিন্তু হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের নাট্যরচনা প্রবর্তনের মত নয়। এবার একে একে বাংলায় বহু নাটক রচিত ও প্রকাশিত হল। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) প্রভৃতি নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যকার হিসাবে অবির্ভাবের পূর্বে ('শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৯) উল্লেখযোগ্য। অবশ্য স্বীকার করতে হবে মধুসূদন দত্তের নাট্যকার হিসাবে আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় যে নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল সেগুলির শিল্পরূপ সাধারণ মানের। মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রথম সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল।

তাহলে কি বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বদেশীয় কোন ইতিহাস নেই ? এদেশে অভিনয় শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না ? উত্তরে বলা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্যধরনের নাট্যশিল্পের সদৃশ শিল্পকলার অস্তিত্ব না থাকলেও

এদেশে অভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষগুলি ধর্মীয় আচার উৎসব উপলক্ষে প্রাগাধুনিক যুগেই অভিনয়ের প্রচলন করেন। এতে অবশ্য বাস্তব জীবন সমস্যার কোন দ্বন্দ্ব থাকত না, মূলত ধর্মীয় ভাবনার বিষয়টি গৃহীত হত। এভাবে বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিনয়ের একটি ধারা প্রচলিত ছিল। এজাতীয় অভিনয়কে 'যাত্রা' বলা হয়। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এই 'যাত্রা' বিষয়ে বলেন;—

> "যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতীত কোনো দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত। ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং প্রথমতঃ, যাত্রা বলিতে উৎসব উপলক্ষে গমন এই ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল। কালক্রমে কোন স্থানে গমন না করিয়া একই স্থানে বসিয়া দেবলীলা অভিনয় করা হইত। এই ভাবে দেবযাত্রা অভিনেতব্য যাত্রা রূপ লাভ করে।" (১)

জানা গেল, এদেশে যাত্রা নামে অভিনয়ের একটি ধারা দীর্ঘ দিন থেকে প্রচলিত ছিল। আবার অষ্টাদশ শতক থেকে কবিগান নামে একটি কথোপকথন মূলক সঙ্গীতের ধারা জনমনোরঞ্জনের মাধ্যম ছিল। যা পরবর্তী শতকেও বেশ জনপ্রিয় ছিল ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে যাঁরা বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন;—জি. সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, হরচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ । একটি বিষয় বিশেষভাবে নজরে আসে, তা হল — প্রথমতঃ এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের এই নবপ্রকরণটির উন্নয়নের জন্য মনোযোগী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সমকালীন সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই সময়ের নাটক একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল ।

বাংলা নাটকের আদর্শ সন্ধানে প্রথম দিকে যাঁরা সফল সৈনিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্। তিনিই প্রথম বাংলা নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনীত হয়। সচেতনভাবে বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয়ের দিক থেকে যা প্রথম পদক্ষেপ। আশ্চর্যের বিষয় এরপর দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর বাংলা নাটক রচিত হয় নি। এমনকি দু-একটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া গেলেও বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্-এর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হল—বাংলায় যে নাটক লেখা ও তার অভিনয় করা সম্ভব তা প্রথম তাঁর দ্বারাই প্রামণিত হয়। এবং সবচাইতে বিস্ময়ের

ব্যাপার একজন রুশ দেশীয় অধিবাসী হয়েও এদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সুগভীর। প্রথম দিকে বাংলা নাটক রচনা করায় তাঁর 'কাল্পনিক সংবদল'-এ কতগুলি অদ্ভুত অনুবাদ আমাদের চোখে পড়ে । নাটকের সঙ্গে কতগুলি পরিভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন Play, অঙ্ক, দৃশ্য প্রভৃতি পরিভাষাকে নিজের মতো বাংলা করেছেন। যেমন — Play অর্থে 'খেলা', অঙ্ক অর্থে 'ক্রিয়া' দৃশ্য অর্থে 'ব্যক্ততা'। পরবর্তীকালে নাট্যকার হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্-এর এইসব অদ্ভুত পরিভাষা যদিও গ্রহণ করা হয় নি তবুও আমরা তাঁর নাট্যচর্চার উদ্যোগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনো স্মরণ করি ।

তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যশিল্পের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

'ভদ্রার্জুন' এর রচনাকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য এই বছরেই 'কীর্তিবিলাস'-এর মত আর একটি বিখ্যাত নাটক রচিত হয় । এর পূর্বে বাংলা নাটক বলতে যা বোঝায়, তার অস্তিত্ব ছিল না । তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্ট। নাটকের 'বিজ্ঞাপন' এর প্রথমেই এবিষয়ে নাট্যকার বলেন;

> "মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধনলাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্তারদিগেরও মানসচন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, অবশ্যই তাহার এক প্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে । অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।" (২)

নাট্যকার কথিত 'অব্যক্ত' না থাকার বিষয়টি কি ? আমরা বলব নাটকের উন্নতির বিষয়। অর্থাৎ 'ভদ্রার্জুন' নাটকের দ্বারা নাট্যকার তারাচরণ শিকদার বাংলা নাটকের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেন। 'বিজ্ঞাপন'-এ নাট্যকার সমকালের বাংলা নাটকের কয়েকটি বিষয়ে বিরক্তির কথা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায় ;—

"এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃতভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।" (৩)

নাট্যকার মনে করেন নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থিত হলে সঙ্গীতের দ্বারা তাকে প্রকাশ করা ও মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের উপস্থিতি নাটকের শিল্পরূপের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য নাট্যকার তারাচরণ শিকদার ইউরোপীয় ও প্রয়োজনীয় দেশীয় আদর্শে সমকালীন সমাজ সংস্কারকদের মত বাংলা নাটকের সংস্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি 'নান্দী' 'সূত্রধার', 'বিদূষক' প্রভৃতি চরিত্রকে পরিহার করেন। নাটকের Unity of Action ও Unity of Space-এর সঠিক ব্যবহার করেন এবং ইংরেজী নাটকের মতো অঙ্কের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 'সংযোগস্থল' নামে অঙ্কের বিভাগ করেন। আবার দেশীয় নাটকের মতো গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার করেন। তারাচরণ শিকদার বাংলা নাটকের উন্নয়নের কথাটি মাথায় রেখে বলতে বাধ্য হন;—

"বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহা দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।" (৪)

অতএব ভূমিকায় এই স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়, সমকালের বাংলা নাটকের অনুৎকর্ষতা দূর করার জন্য নাট্যকার তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের একটি সমস্যা আছে। সমস্যাটি হল 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা কে ? পাদ্রী লঙ্ সাহেব বলেন — 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা 'G. C. Gupta', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং সুকুমার সেন মনে করেন— নাট্যকারের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। অবশ্য নাট্যকার সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও নাটকটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। নাট্যকার 'ভূমিকা'-য় বলেছেন সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা রচিত যাত্রাগুলি

অত্যন্ত বিরস । তিনি আশা করেন;—"যদি সাধারণের উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে যাত্রার উৎকৃষ্টতা জন্মে...।" [৫] বলা বাহুল্য, এখানে নাট্যকারের যাত্রার 'উৎকৃষ্টতা' সৃষ্টির প্রয়াস উৎকৃষ্ট নাটক রচনাকেই নির্দেশ করেছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা অভিনয়ের উপযোগী রচনাকে 'উৎকৃষ্টতা' দানের জন্য কলম ধরেছেন ।

'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে। ভারতবর্ষে ট্র্যাজেডি বলে কোন দর্শন ছিল না। ভারতীয়রা মিলনান্ত দর্শনে বিশ্বাসী। 'কীর্তিবিলাস'-এর নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তাঁর ভাষায়;—

> "অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপিয়ার নামা ইংগ্লণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী ...অ্যারিস্টটল নামা গ্রীস দেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কখন উক্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালীন দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয়কারকেরাই জয়পতাকা পাইত।"[৬]

'কীর্তিবিলাস' নাটকের 'ভূমিকা'তে পাশ্চাত্য বিয়োগান্তক নাটকের জনপ্রিয়তার কথা জানা গেল। আমাদের বাঙালী নাট্যকারও যেন চেয়েছেন বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তক আদর্শ প্রচলনের দ্বারা বাংলা নাট্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি। এজন্য তিনি 'ভূমিকা'- য় ভারতীয় পণ্ডিতের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেন;—

> "ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র।" [৭]

অর্থাৎ নাট্যকার ভারতীয় মিলনান্তক দর্শনকে অসম্পূর্ণ দর্শন বলতে চেয়েছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেবার জন্য ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক বিষয়কে বাংলা সাহিত্যে স্থান দিয়ে উদার মনোভাবের পরিচয় দেন। সেজন্য নাট্যকার 'কীর্তিবিলাস'-এর রাজকুমার কীর্তিবিলাস ও তার পত্নী সৌদামনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিষাদময় পরিণতি অঙ্কন করেছেন। যাকে আমরা মাতৃভাষার নাটককে সমৃদ্ধ করার একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

বাংলা নাট্যচর্চার প্রথম দিকে স্বনামধন্য নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)। তিনি এত নাট্যপ্রাণ ছিলেন যে, তাঁর নামই হয়েছিল 'নাটুকে রামনারায়ণ'। তাঁর একাধিক নাটকের মধ্যে মধুসূদনের অবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল —'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণীসংহার' (১৮৫৭) ও 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)।

'কুলীনকুলসর্বস্ব'(১৮৫৪) নাটকটি রামনারায়ণের প্রথম নাটক। বাংলার কুলীন রমণীদের দুরবস্থার চিত্র উদ্‌ঘাটনই এর মুখ্য বিষয়। নাটকের 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি প্রার্থনা করেন;— "এক্ষণে প্রার্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।" [৮] 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিকে বিজ্ঞ সমাজে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নাট্যকার রামনারায়ণের একটি উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো। আমরা বলতে পারি নাট্যকারের এরকম উদ্যোগের পিছনে নাটকের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসার সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া তিনি শুধু কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণের বিজ্ঞাপনে উৎসাহিত হয়েই এরকম নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন নি, এবিষয়ে কিছু লিখবেন বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। নাট্যকার রামনারায়ণের ভাষায়;—

> "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কূল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম;" [৯]

রামনারায়ণের প্রাক্‌পরিকল্পনা ও কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণের উৎসাহ তাঁকে বাংলা নাট্য সাহিত্য সেবায় নিয়োগ করে।

'বেণীসংহার' (১৮৫৭) রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি অনুবাদমূলক নাটক। এই নাটকটি অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ দর্শকের জন্য রচিত হয়। নাট্যকার 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—

> "মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে বেণীসংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর করুণারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য-নাটকমধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।...কিন্তু সংস্কৃত ভাষানবিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রস আস্বাদনে অসমর্থ, এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম।" [১০]

সংস্কৃত পণ্ডিত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন সাধারণ মানুষের জন্য বাংলা ভাষায় 'বেণীসংহার' নাটকটি অনুবাদ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল,—সংস্কৃত পণ্ডিত নাট্যকার এই নাটকে নান্দী, সূত্রধার, নটী, বিদূষক, এমনকি সঙ্গীতেরও ব্যবহার করেন নি। প্রাক্ মধুসূদন যুগে এরকম বাংলা নাটক বাংলা

নাট্যসাহিত্যে বৈচিত্র্য এনেছে। 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এর শেষে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন আশা করেন;—"এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।" (১১) মাতৃভাষায় নাটকটির অনুবাদ ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির সহানুভূতি কামনা নাট্যকারের মাতৃভাষার নাটককে সমৃদ্ধ করার বাসনাকেই মনে করিয়ে দেয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের বিখ্যাত নাটক 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটকের উন্নয়নের জন্য যে কলম ধরেছেন; সেকথা 'রত্নাবলী'র বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট। সমকালের দর্শক ইংরেজী নাটক ও সংস্কৃত নাটকের সমৃদ্ধ সাহিত্য রস আস্বাদনের ফলে দেশীয় যাত্রার প্রতি অনেকটা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। অতএব মাতৃভাষায় অভিনয়ের উপযোগী ভালো নাটকের অভাব একটা বড় সমস্যা। যা দূর করা বাঞ্ছনীয়। তাই রামনারায়ণ মাতৃভাষায় সাহিত্য রস সমৃদ্ধ নাটক রচনার জন্য কলম ধরেন। বিষয়টিকে নাট্যকারের ভাষায় ব্যক্ত করা যায়;—

> "সরস সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের অস্বাদন পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জনসমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটক সংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সম্যক সফল হইতেছে না; অতএব সেই অভাব দূরীকরণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নাশীল হওয়া আবশ্যক। অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা সত্বেও এই গুরুতর অধ্যবসায়ে আমার প্রবৃত্তি হওয়ারও ইহাই এক প্রধান কারণ।" (১২)

অর্থাৎ রামনারায়ণ বাংলার হীনরুচি সম্পন্ন যাত্রার রস থেকে উন্নত রুচিসম্পন্ন নাটক রচনায় আগ্রহী হন। হয়ত এই উদ্দেশ্যে তিনি মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের পরেও অনেকগুলি নাটক রচনা করেন।

এই সময়ে আরো যাঁরা বাংলা নাটক রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য—হরচন্দ্র ঘোষ ও কালী প্রসন্ন সিংহ। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভারত্রী দুঃখিনী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' (১৮৫৪) নাটক দু'টি মৌলিক রচনা। এঁদের বাকী অন্য নাটকগুলি সবই অনুবাদ মূলক। হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মূলত অনুবাদমূলক নাটক লিখে বাংলা রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যধারাকে গতিদান করেছেন। এরপর আমরা দুই প্রতিভাবান নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যে অবদান বিষয়ে আলোচনা করব।

বাঙালী কর্তৃক সচেতনভাবে বাংলা নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময়ে প্রথম কয়েকটি বছর ইংরেজী অথবা সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে অনুসরণ করা হয়েছিল। কখনো ইংরেজী নাটকের আদর্শে জি.সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাটকে পঞ্চমাঙ্ক, বিয়োগান্তক কাহিনী নির্বাচন, নটনটী-সূত্রধার-নান্দী প্রভৃতি চরিত্র বর্জন, আবার কখনো রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে গ্রহণ করে নটনটী-নান্দী-সূত্রধার প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ ও সংগীতের দ্বারা নাট্য কাহিনী রচনা প্রভৃতি নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বাংলা নাটক রচিত হয়। বাংলা নাটক রচনার এমন একটি দোলাচল বৃত্তির সময়ে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত আবির্ভূত হন ।

প্রকৃত বন্ধুর সুপরামর্শ ও সঠিক পথনির্দেশ কত মূল্যবান তা মধুসূদন দত্তের জীবনে লক্ষ করা যায় । মাদ্রাজে 'ক্যাপটিভ লেডী'-র (১৮৪৯) আশানুরূপ সমাদর না হওয়ায় যখন তিনি বিষন্ন, ঠিক তখন বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে বলেন। গৌরদাস তাঁকে একটি কেরাণীর চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। এখানেই শেষ নয়, গৌরদাসই মধুসূদনকে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করার প্রস্তাব দেন। এ প্রসঙ্গে 'মধুসূদন দত্তের 'জীবনচরিত'-এ যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন;—

> "মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিস আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে, গৌরদাসবাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদনের নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না। হিন্দু কলেজে অধ্যায়নাবস্থা হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল; এবং 'ক্যাপটিভ্ লেডী' হইতে অনেকেই তাঁহার ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আহ্লাদের সহিত গৌরদাসবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মধুসূদনের উপর 'রত্নাবলী'র অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন।" (১৩)

এই সময় বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'রত্নাবলী' নাটকটি প্রতাপসিংহ ও ঈশ্বর সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'-য় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় । মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের অনুবাদ করতে এসে অনুভব করেন, মাতৃভাষায় নাটকের কি নিদারুণ দশা। মধুসূদন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাসকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাতৃভাষায় নাটকের অনুৎকর্ষতার কথাটি জানান। এবং সাহিত্য গুণ সমৃদ্ধ নাটক লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন;—

> "একদিন 'রত্নাবলী'র অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন, গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, "দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।"

গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি ? 'বিদ্যাসুন্দরে'র ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে, আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায় ?" মধুসূদন বলিলেন, "ভাল নাটক ? আচ্ছা, আমি রচনা করিব।" (১৪)

স্বদেশীয় সংস্কৃতি তথা মাতৃভাষায় নাটকের দুরবস্থায় মধুসূদন যে মর্মপীড়িত ছিলেন, তা তাঁর প্রথম নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' ও প্রস্তাবনায় স্পষ্ট। মধুসূদন দত্ত প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শর্মিষ্ঠা' উপহার দিয়ে বলেন;—

"মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।" (১৫)

এখানে প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পের প্রতি মধুসূদনের গৌরববোধের প্রকাশ এবং মাতৃভাষায় সেই গৌরব অর্জনের জন্য বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনা মূলক সঙ্গীতেও স্পষ্ট। সঙ্গীতটি এই রকম;—

শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয়-নিচয়।" (১৬)

—এই সঙ্গীতটিতেও প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পের জন্য গৌরব এবং সমকালের নাটকের অনুৎকর্ষতার জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যকে শিল্পসমৃদ্ধ করার জন্য মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা'র পরেও একাধিক নাটক ও প্রহসন লেখেন। যথা;—'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং 'মায়াকানন' (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যের উন্নতি করতে চেয়ে কতখানি সফল হয়েছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকই প্রকাশিত হয় নি। 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনা কাল ১৮৬০-এর ৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এর প্রকাশ কাল ২রা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ বা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনার পর দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা নাটকের এই পর্বের নাটকগুলি পাঠ করে মনে করেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক হিসাবে সার্থক। তাঁর ভাষায়;—

> "কৃষ্ণকুমারী—নাটকের মূলকথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের প্রতি নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি।...কৃষ্ণকুমারী পূর্ববর্তী বাঙ্গালা নাট্যরচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী অধিকাংশ নাটকের তুলনায়ও ভালো।" (১৭)

অর্থাৎ 'কৃষ্ণকুমারী' তথা মধুসূদন দত্তের দ্বারা বাংলা নাটক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এরকম একটি সার্থক নাটকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্ট করা যাক্। প্রথমে বলা যায়, বাংলা নাট্য সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র ধনদাস ও মদনিকা। ধনদাস জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহের পারিষদ। অলস ও বিলাসপ্রিয় রাজা জগৎসিংহের সমস্ত অপকর্মের অভিভাবক। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ধনদাস রাজা জগৎসিংহকে পরিচালনা করে। এমনকি সে রাজার কাছে মন্ত্রীর চেয়েও বিশ্বস্ত। জয়পুর রাজগৃহে ধনদাস এলে রাজা তাকে স্বাগত জানায়। সংলাপটি এইরকম;—

"রাজা। ...(ধনদাসের প্রবেশ) আরে, ধনদাস ? এস, এস, তবে ভাল আছ ত ?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি ? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্মই হবে না। দূর হোক্! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম। (প্রস্থান)।

রাজা। তবে সংবাদ কি,বল দেখি ?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য ফুল বাকী আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি? বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা তো নয় সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?" (১৮)

—এখানে ধনদাস ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কৌশলে রাজা জগৎসিংহের নিকট থেকে একটি 'উপায়' বের করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল বলেই ধনদাস রাজাকে মোহিত করতে পেরেছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি করেন। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডী রচনার কৃতিত্বও মধুসূদনের প্রাপ্য। মধুসূদন দত্তের জীবনীকার এই প্রসঙ্গে বলেন;—

" 'কৃষ্ণকুমারী' বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিষাদান্ত নাটক। 'নীলদর্পণ' ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকরও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাত্র ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিষাদান্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।" (১৯)

'কৃষ্ণকুমারী'র ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠক ও দর্শকের মনে করুণ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রাজা ভীম সিংহ হীনবল, নিজ শক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করার সামর্থ তাঁর নেই। যে মহাবিপদ তাঁর এসেছে, সেই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে একটি প্রস্তাব আসে। রাজা ভীম সিংহ আদরের কন্যার প্রাণ রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার কর্তব্য পালনে দোলাচল হয়ে পড়েন। ভীম সিংহ বলেন;—

"(চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়। — না, —তাতেই বা কি হবে? ...বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিপদ যে মেটে, এমন ত্তে কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্বনাশ। উঃ —না, না, (গাত্রোত্থান)

তা বলে কি আমি একর্মে সম্মত হতে পারি ? সত্যদাস, এমন কর্ম চন্ডালেও কত্যে পারে না। আর চন্ডাল ত্রে মনুষ্য, এমন কর্ম পশুপক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।" (২০)

নাটকে একদিকে কন্যাস্নেহ ও অন্যদিকে রাজ্যরক্ষার মহাদায়িত্ব তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। ভীমসিংহের এই করুণ দশা নাটকটি করুণ রসাত্মক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। পূর্ববর্তী নাট্যকারের তুলনায় মধুসূদন দত্তের নাটকে নাটকীয় স্বগতোক্তির শিল্পসমৃদ্ধ প্রকাশ চোখে পড়ে। প্রাক্ মধুসূদন পর্বের বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের বিখ্যাত নাটক 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) এর নাটকীয় স্বগতোক্তি নিতান্ত সাধারণ। নাট্যকারের ভাষায়;—

"কুলপা। (স্বগত) হা বিধে! আমার কি পূর্বজন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল! কি ক্লেশ! কতদিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন; কবে আমাকে চিন্তাবিহীন করিবেন; শাস্ত্রে কথিত আছে "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিনং।" আর মনুষ্যদিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন; কবে কুল রক্ষা করিবেন ? আমি, বহুদিন হইল, যে অঘটন ঘটনা-পটু ঘটকদ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলাম তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি ?" (২১)

কুলীন রীতি অনুসারে মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে কুলপালক চিন্তিত। কুলপালক সেই চিন্তার জন্যই যেন স্বগতোক্তির দ্বারা বিলাপ করেছেন। অন্যদিকে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মদনিকা ধনদাসের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এরকম অবস্থায় একাকী মদনিকা স্বগতোক্তি করেছে;—

"মদনিকা। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভালো করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি ? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন। —আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে ধনদাসের সর্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকেএক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন! হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে ? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি। —এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে

আসচেন। হয়েছে আর কি! —মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন ? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায় । হা, হা, হা! এ তো মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হউক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয় ।" (২২)

—শুধুমাত্র একমুখী আত্মতুষ্টি নয়, মদনিকার উক্ত স্বগতোক্তিতে সহানুভূতি বা সহমর্মিতা, কার্যকে আরো সফল করার উদ্যোগ ও কৌশল অবলম্বন, প্রতিযোগী মনোভাব প্রভৃতি একাধিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে; যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বগতোক্তির ধারায় সার্থক প্রয়াস।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে মধুসূদনের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল । তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা থেকেই পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ লক্ষ করা যায়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে পাশ্চাত্য আদর্শ দেখা গেলেও মধুসূদনের নাটকেই পাশ্চাত্য আদর্শের সফল প্রয়োগ হয়েছে। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন ;—

"সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পর্য্যন্ত ছিল না। মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা'য়, কিয়ৎপরিমাণে, ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" (২৩)

অর্থাৎ বাংলা নাটকের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ যে একান্ত প্রয়োজন, মধুসূদন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। নাট্যকার মধুসূদন দত্তের এইসব মহৎ প্রয়াস পরবর্তীকালে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বললে অতিশয়োক্তি হবে না ।

এবার বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। এতে সমকালের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এজাতীয় নাটক এই প্রথম। 'নীলদর্পণ'-এর পর দীনবন্ধু মিত্র আরো একাধিক নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। যথা;— 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। আমাদের প্রশ্ন, দীনবন্ধু মিত্র উল্লিখিত একাধিক নাটক লিখে নাট্যশিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রাখতে পেরেছিলেন । ডঃ সুকুমার সেন দীনবন্ধু মিত্র প্রসঙ্গে বলেন;—

"কিন্তু দীনবন্ধুর হাতে বাঙ্গালা নাটকের গঠনকৌশলের কোনই উন্নতি হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নিজের অভিজ্ঞতাসামগ্রী হইতে বিভিন্ন ভূমিকার ও উপাখ্যানের পরিকল্পনা।" (২৪)

আদুরী, তোরাপ, পেঁচোর মা, পদ্মলোচন, রাজীব মুখোপাধ্যায়, নিমচাঁদ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি এবং 'নীলদর্পণ'-এর আর্থ-রাজনৈতিক কাহিনী, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বুড়ো বয়সে বিয়ের বাসনার মতো কাহিনী, 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের শিক্ষিত মনের দুর্বিষহ বেদনা ও ধনীর পুত্র মুর্খ অটলের বাবুগিরির কাহিনী—সমকালে বাংলা নাট্যধারার মধ্যে অভিনব আস্বাদের আবেদন রেখেছিল। দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তা আরো ব্যাপক আকার পায়, যখন তাঁর নাটকগুলি নাট্যানুরাগী সাধারণ যুবকের দল অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। প্রথম দিকে সাধারণ দর্শকের অভিনয় দেখার সুযোগ হত না। সে সময় রাজা-জমিদারের উদ্যোগে সখের থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনীত হত । গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রমুখ নাট্যানুরাগী যুবক 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' নামে একটি অভিনয়ের দল গঠন করেন । বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমীপূজার দিন 'সধবার একাদশী'র দ্বারা বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় । এরপর দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' ও অন্যান্য নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করা হয়। এমতাবস্থায় অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ টিকিট বিক্রির দ্বারা অভিনয়ের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর থেকেই সামান্য অর্থের বিনিময়ে আপামর সাধারণ বাঙালী বাংলা নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পান। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' নামক গ্রন্থে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান বিষয়ে বলা হয়েছে;—

> "দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি কলিকাতা ও মফস্বলের সখের নাট্যশালা কর্তৃক বহুবার অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন না কোন অভিজাত বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হইতে লাগিল।....মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২) করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন," (২৫)

নগেন্দ্রনাথ, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যানুরাগী যুবক দীনবন্ধুর নাটক হাতে পেয়েছিলেন বলেই সহজে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন । দীনবন্ধু মিত্রের নাটক না থাকলে তাঁরা বাংলা নাটক অভিনয় করতে সাহসী হতেন না । এবিষয়ে নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন;—

"বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। ...যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" (২৬)

অর্থাৎ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত নাটক লিখে বাংলা নাটককে জনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখেন। ডঃ সুকুমার সেন দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের জনপ্রিয়তার পিছনে আরো কতকগুলি কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

"দীনবন্ধুর নাট্যরচনাগুলি লইয়াই কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ নাট্যশালা জমিয়া উঠিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এমনকি তাহার পূর্ব হইতেও আমাদের দেশে নৃত্যগীতাভিনয়ের মধ্যে সঙই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তাই প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনাই অভিনয়ে সাধারণ দর্শককে বেশী আকৃষ্ট করিত। দীনবন্ধুর নাটকে কৌতুকরসই প্রধান, এবং এই কৌতুক রস সর্বত্র ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত নয়। তাই সাধারণ দর্শকের কাছে দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয় সমাদৃত ছিল। (২৭)

অর্থাৎ সাধারণ দর্শকের কাছে হাস্যরসাশ্রিত কৌতুক রসপ্রধান বিষয় খুব জনপ্রিয় ছিল।

অতএব দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক বিষয় নির্ভর নাটকের স্বল্প ব্যয়ে অভিনয় করার সুবিধা ও বাঙালী রুচির অনুকূল হাস্যরসাশ্রিত কৌতুক রস প্রধান বাংলা নাটক আপামর বাঙালীকে নাটক দেখার সুযোগ এনে দিয়েছিল । সংক্ষেপে বাংলা নাট্য সাহিত্য ও নাট্যশিল্পে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান এরকম ।

বাংলা নাটক ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণের আলোচনার শেষে বলা যায়, হেরাসিম স্তেফান্‌ভিচ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল' (১৭৯৫) ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে জি. সি. গুপ্ত (১৮৫২) তারাচরণ শিকদার (১৮৫২) প্রমুখ নাট্যকার বাংলায় নাটক রচনা করেন। এই পর্বে শুধু নাটক রচনা করাই নয়, বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ নাটক রচনা করার মহৎ উদ্দেশ্যটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই মহৎ উদ্দেশ্যটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের হাতে প্রথম সার্থকতা লাভ করে এবং বাংলা নাটক সাহিত্য হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পায় । আমরা বাংলা নাটকের শিল্প

হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর্বকে ক্রমান্বয়ে বাংলা নাটকে উত্তরণ বলতে চেয়েছি। মাতৃভাষায় বাঙালীর নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য, স্বদেশের নাট্যশিল্প ও সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছে। অতএব বাংলা নাটক ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণের মধ্যে পরোক্ষে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় বাংলা নাটক সৃষ্টি ঃ

বাংলা দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ক্রমশ মানব কথা স্থান পায়। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ নাট্যসাহিত্যেও মানবকথা আসে। সাহিত্যের এই উদারতার ফলে এই শতকে বাঙালী সমাজের নানা আন্দোলন বিষয় হয়ে উঠে আসে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালী মনীষী সমকালীন সমাজের নানা বৈষম্যকে মেনে নেন নি। বিশেষত নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মানবতাবাদী মনীষী প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। তাছাড়া এই সময়ে প্রাচীনপন্থীর সংকীর্ণতা ও নব্যপন্থীর উচ্ছৃঙ্খলতা মানবতাবাদী মনীষীকে বেশ ভাবিয়েছিল। সমাজের দুর্বলদের প্রতি বৈষম্য, প্রাচীনপন্থীদের সংকীর্ণতা, নব্যপন্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনুকরণপ্রিয়তা বাঙালী সমাজের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। নাট্যকার সমাজ-সচেতন হওয়ায় সমাজের পক্ষে এইসব ক্ষতিকারক দিকগুলিকে নাটকের বিষয় করেছিলেন। সেজন্য বলা যায়, এই শতকের সমাজ সংস্কারমূলক নাটকগুলি বাঙালীর আত্মচেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আত্মচেতনামূলক সামাজিক নাটকগুলি অনেক সময় ব্যঙ্গমূলক, আবার অনেক সময় মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদনমূলক। অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা নাটক শুধুমাত্র বিনোদনের বিষয় হয়ে না থেকে সমাজ সংস্কারের গতিকেও ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময়ের নাট্যকারগণ সমাজ সংস্কারের ভাবনাকে দু'ভাবে প্রভাবিত করেন। রঙ্গব্যঙ্গ রচনা বা প্রহসন মূলক রচনার দ্বারা ও মানবিক অনুভূতির কাছে আবেদনের দ্বারা। আমরা প্রথমে রঙ্গব্যঙ্গ বা প্রহসনের দ্বারা সমাজ সংস্কারের প্রেরণা বিষয়ে আলোকপাত করব। ঊনবিংশ শতাব্দীর দু'জন বিখ্যাত নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কয়েকটি প্রহসন মূলক নাটকের দ্বারা সমাজকে সচেতন করার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করা যায়।

আমরা জানি, মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা সৃষ্টির জন্য কলম ধরেছেন। কিন্তু দুখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে তিনি সমাজের অনাচারকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

উনিশ শতকের কলকাতাবাসীর অনেকেই স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিবেচনায় স্বদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির থেকে বিদেশীয় সভ্যতা ও

সংস্কৃতি অনেক বেশী প্রয়োজনীয় । অতএব তাঁরা মনে করতেন—বিদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বাঙালী জীবনে জরুরি । নাট্যকার মধুসূদন দত্ত এই বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণকারিদের নিয়ে নাটক লিখেছেন । নাট্যকার দেখানোর চেষ্টা করেন যে, এই অনুকরণকারিদের জীবনাচরণ সমাজকে উন্নত না করে বরং ক্ষতি করছে। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন;—

> "তখন কলিকাতা-সমাজে শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা, সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের নামে, স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন, এবং শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইহাদিগকে 'ইয়ংবেঙ্গল' বলিত। ...'একেই কি বলে সভ্যতা' এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল ।" (২৮)

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নবকুমার ও কালীনাথবাবুরা বিদেশীয় আচার আচরণকে মেনে চলে; পাশাপাশি দেশীয় আচার-আচরণকে ঠিক ততখানি ঘৃণা করে। এরা বিধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি 'সোসীয়াল রিফরমেশন' এর চেষ্টায় রত । নবকুমার বলেছে;—

> "জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর" (২৯)

কিংবা,

> "জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।" (৩০)

এখানে ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য ইয়ংবেঙ্গলের মতামত প্রকাশ পেয়েছে । তাদের মতে ভারতীয় আচার-রীতি ত্যাগ করে, বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণ করলেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন হবে । ইয়ংবেঙ্গলের দেশানুরাগের পথ যে সঠিক নয় 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ব্যঙ্গ করে নাট্যকার মধুসূদন দত্ত সেকথাই প্রকাশ করার চেষ্টা

করেন। স্বীকার করতে হবে তাদের দেশানুরাগ অতি মহৎ কিন্তু তারা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগানুরাগের উর্ধ্বে উঠে দেশানুরাগী হতে পারেন নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় ইয়ংবেঙ্গলের অনুকরণপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগানুরাগকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

নবকুমার, কালীনাথবাবু ও তাদের সাথীরা বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, জাতপাত বর্জনের মতো মহৎ ও পবিত্র কাজের ব্যাপারে আগ্রহী। অবশ্য এসব মহৎ কাজে তাদের উদ্যোগ শুধুমাত্র সভা-সমিতিতে গালভরা বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা সাহেবদের অনুকরণে যুবতী বোনের গালে চুম্বন দেয়, দেশীয় ঠাকুর দেবতাকে হাঁটু মুড়ে মাথা নোয়ানোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে। এছাড়া মদ্যপান, বারবিলাসিনীর সংসর্গ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণের মধ্যেই এদের সোসাল রিফর্মেশন সীমাবদ্ধ। সেজন্য ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বলেছে;— "...ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খ্যেয়ে ঢল্যাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? — একেই কি বলে সভ্যতা ? (৩১)

'বুড়-সালিকের ঘাড়ে রোঁ'—মধুসূদনের সমাজ সচেতনতার ফসল। ক্ষমতাবান ব্যক্তির লাম্পট্য ও ভোগাকাঙ্ক্ষা সুস্থ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে পাশ্চাত্য উদার চেতনা বর্জিত সংকীর্ণ ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্য ও অনাচার মূল বিষয়। ভক্তপ্রসাদ রূপবতী নারী দেখলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়। প্রতিবেশী কন্যাসম পাঁচিকে দেখে তার লালসা জেগে উঠে। সে বলে;—

> "হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।" (৩২)

কিংবা বিধর্মী হানিফের সুন্দরী স্ত্রী ফতেমার রূপের কথা শুনে, ভক্তপ্রসাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠে। সে বলেছে ;—"দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমনতো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; — বড় সুন্দরী বটে," (৩৩) —এতো গেল ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্য দোষের খতিয়ান, যা সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। তার সংকীর্ণ মনোভাবও সুস্থ ও উন্নত সমাজ গঠনের প্রতিকূল। ধর্ম তার কাছে আচার-আচরণ সর্বস্ব। এবং অধর্মাচরণ বলতে সে মনে করে;—"এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—" (৩৪) কিংবা কলকাতার উদারপন্থীর বর্ণ বৈষম্য বা জাতপাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো ঘটনায় ভক্তপ্রসাদ শঙ্কিত। তার

ভাষায়;—"কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখচি আর কোন প্রকারেই রইলো না! আর রইবেই বা কেমন করে ? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়।" (৩৫) —যার মনোভাব এমন সংকীর্ণ, তার দ্বারা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাহিনীর শেষে ভক্তপ্রসাদ হানিফের স্ত্রী ফতেমাকে ভোগ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এবার ভক্তপ্রসাদ চরম অপমানিত হয়ে বাচস্পতি ও হানিফের দেওয়া শর্তে রাজি হয়। নাটকের শেষে বিবেক দংশনগ্রস্ত ভক্তপ্রসাদ বলে;—

> "...আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কর্মের দক্ষিণান্ত এই রূপেই হওয়া উচিত। যা হোক্ ভাই, তোমাদের হাতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম।...এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।" (৩৬)

আলোচ্য প্রহসন দু'টিতে মধুসূদন দত্ত সমাজের অনাচারকে বিষয় করেছেন। বলাবাহুল্য এই অনাচার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আমরা লক্ষ করলাম;— 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় উগ্র আধুনিক তথা আধুনিকতার অনুসরণকারীদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাম্পট্য ও সংকীর্ণ মনোভাবের প্রাচীনপন্থীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অভিনয় দেখলে বা পাঠ করলে উগ্র আধুনিকপন্থী বা অনুকরণকারীর দল এবং অনুদার প্রাচীনপন্থীর দল সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হতে বাধ্য। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, গ্রন্থ দু'টির বিষয় তাদের চেতনাকেও নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। হয়ত সেজন্যই মধুসূদন দত্ত এই প্রহসন দু'টি রচনা করেছিলেন।

এবার দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি ব্যঙ্গমূলক নাটকের আলোচনা করা হবে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' একটি ব্যঙ্গমূলক নাট্যগ্রন্থ। বিয়ের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়। এদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে, তাতে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পাশাপাশি মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে ছিল কঠিন সামাজিক নিয়ম। বিশেষত পাত্র নির্বাচনে তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। তাই বালিকার সঙ্গে বুড়োর বিয়ে এদেশে নতুন নয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে বালিকাবধূ যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র সমাজে বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের অসাঞ্জস্যপূর্ণ বিবাহের ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ এনেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে পাগল বুড়ো রাজীবলোচনের সঙ্গে কোন বালিকার বিয়ে হয় নি। বালিকার সঙ্গে বুড়োর বিয়ের প্রসঙ্গ থাকলেও রাজীবলোচন শেষপর্যন্ত নকল বালিকাকে বিয়ে করেছে। এবং বউ ভেবে হাত ধরে বাড়িতে এনেছে পেঁচোর মাকে। সেজন্য কোন হৃদয়বান ব্যক্তি 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' পাঠ করে বা অভিনয় দেখে আহত হন না। বরং বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে উদ্যোগী রাজীবলোচনের নাকাল দশা দেখে আমাদের হাসি পায়।

আমরা লক্ষ করেছি, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। এই সময় সমাজে নবজাগরণ দেখা দিলেও চেতনাহীন ব্যক্তি বহুবিবাহ, বালিকা বিবাহ বা পুরুষের অধিক বয়সে বিয়ে করাকে অন্যায় মনে করত না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'য় এই জাতীয় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন। পাশাপাশি সমাজে নারীর মানবিক মহিমা রক্ষার জন্য বিধবার বিয়ের সমর্থন-এর প্রসঙ্গ আছে। বৃদ্ধ রাজীবলোচন নিজের অল্পবয়স্ক বিধবা মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করলেও বালিকা বিবাহ করতে এসে বলেছে;— "...বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোশামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।"(৩৭) রাজীবলোচনের দুই বিধবা মেয়ে বিধবা বিবাহকে মনে প্রাণে সমর্থন করে। বড় মেয়ে রামমণি বলে;—"আহা! যিনি সমরণের পদ্যি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।" (৩৮)

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মতো 'সধবার একাদশী'তে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আছে। আমরা জানি বিধবা- নারীর নিকট একাদশী একটি কঠিন ব্রত। 'সধবার একাদশী'তে স্বামী বেঁচে থাকলেও কুমুদিনী স্বামী সোহাগ থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত এবং অপমানিত। বাস্তবিক সে সধবা হয়েও বিধবার মতো যন্ত্রণা নিয়ে দিনাতিপাত করে। সেই হিসাবে 'সধবার একাদশী' গ্রন্থনাম সার্থক। প্রশ্ন হতে পারে— কুমুদিনীর এই যন্ত্রণার জন্য দায়ী কে? অবশ্যই তার স্বামী অটল। অটল সমকালীন ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে। ধনাঢ্য পিতার শাসনহীনতায় ও মায়ের আদরে তাঁর মানুষ হওয়া হয়নি। অটল প্রসঙ্গে নিমচাঁদের মূল্যায়ন এইরকম;—

"মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি" (৩৯)

—অটল বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদ্যপানে বিভোর, বারবিলাসিনীর পোষক এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। এজাতীয় চিত্র আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসে' লক্ষ করেছি। এই সব রচনার উদ্দেশ্য সমাজকে সচেতন করা। 'সধবার একাদশী'তেও আমরা ধনীর দুলালের অধঃপাতে যাওয়ার একটি আখ্যান পাই। অতএব এই রচনাটির উদ্দেশ্য সমাজ সচেতন করা— সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে 'সধবার একাদশী' গ্রন্থটির আবেদন— আরো একটু বিস্তৃত, নিমচাঁদ শিক্ষিত ও বিবেকবান হয়েও মুর্খ অটলের বন্ধু। নিমচাঁদ তার শিক্ষা ও চেতনাকে সৎকাজে প্রয়োগ করতে পারছে না। সমকালীন কলকাতার সমাজ সম্বন্ধে তার খেদ রয়েছে। সে বলে;—

> "কলিকাতায় লোকে গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুক্‌লি কচ্চি নে—কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে গর্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা, হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে, আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব।" (৪০)

এখানে নিমচাঁদ নেশার আড়ালে সমাজের সমালোচনা করেছে। যা একটি অসুস্থ সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলে গৃহীত হতে পারে। সমকালীন এই অসুস্থ সমাজ প্রকৃত জ্ঞানীর মূল্য দিতে চায় নি। হয়ত সেজন্যই নিমচাঁদের মতো প্রতিভাবান সোনার ছেলে মাতাল হয়েছে। নারী হরণের মতো অভিযোগ যখন তার বিরুদ্ধে এলো, তখন নিমচাঁদ বলেছে এজাতীয় ব্যভিচার সে করে নি। তার ভাষায়;—"সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" (৪১) নিমচাঁদের এই মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যভিচার কে করেছে? নিমচাঁদের কাছে এর উত্তর হল 'সময়'। 'সময়' ব্যভিচারের জন্য দায়ী। আসলে গভীরভাবে ভাবলে বলতে হবে—সত্যি নিমচাঁদ ও অটল এর জন্য দায়ী নয়। কেননা, সমকালের ধনীর দুলালের বদভ্যাস, এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তির বারাঙ্গনা গৃহে গমন, মদ্যপান, প্রভৃতি অনাচার সমাজকে গ্রাস করেছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষা নবশিক্ষিত যুবককে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে নি। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি অসম্পূর্ণ দিক আছে; যা সমকালের সভ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ করার পক্ষে গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারে নি। নিমচাঁদ বলে;—"সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" (৪২) 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ, অটল প্রমুখ চরিত্রের জীবনে 'বিড়ম্বনা'র জন্য দায়ী প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এই অভাবের প্রসঙ্গের দ্বারা দীনবন্ধু মিত্র যেন পাঠক ও দর্শকের মনে জাতীয় জীবনের ব্যভিচার দূর করার আবেদন জানিয়েছেন।

'জামাই বারিক' দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গমূলক গ্রন্থ। বহুবিবাহ, স্ত্রৈণতা, কর্মবিমুখতার মতো একাধিক বিষয়কে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আমরা জানি, সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পক্ষে বহুবিবাহ, স্ত্রৈণতা ও কর্মবিমুখ মানসিকতা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বহু বিবাহ করলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। 'জামাই বারিক'-এ পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী। দুই স্ত্রী দিনরাত কলহ করে। পদ্মলোচন তার গৃহ বিষয়ে অভয়কুমারকে বলেছে;—

> "আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্‌য়েছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিক তেলের দাগটি লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাক্‌তে হবে।" (৪৩)

'জামাই বারিক'-এর অভয়কুমার স্ত্রৈণ হতে চায় নি। স্ত্রী কামিনীর সেজদিদির বর, স্ত্রৈণ প্রকৃতির। কামিনী চেয়েছিল, তার স্বামী অভয়কুমারও স্ত্রৈণ হোক্। কামিনী দুঃখ করে বলেছে;— "...সেজদিদির ভাতারের দেখিছি—সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।" (৪৪) —কামিনীর কথামত অভয়কুমার চলে না, সেজন্য তাদের অশান্তি। অভয়কুমার অভিমান করে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করে। 'জামাইবারিক'-এ জামাই, ভাই-এর জামাই, বোনের জামাই,

জামাই-এর জামাই সকলেই অকর্মণ্য । নিষ্কর্মা, নেশাখোর প্রকৃতির ব্যক্তি 'জামাইবারিক'-এ এসে জোটে। কেননা, সেখানে থাকা ও খাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলি বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় ।

দীনবন্ধু মিত্র 'জামাইবারিক'-এ নিষ্কর্মা, স্ত্রৈণ ও বহুবিবাহকে ব্যঙ্গ করেছেন । কেননা, এই সব বিষয় উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যেন ব্যঙ্গের দ্বারা সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেন ।

আমরা এবার মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদনের দ্বারা নাট্যকারের সমাজ সংস্কারের বিষয়টি স্পষ্ট করব। মানুষের মানবিক মহিমার শক্তি অপরিসীম । মানবিকতা বোধ মানুষের এক মহৎ গুণ । বাঙালী নাট্যকার বাঙালী সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমকালীন দর্শক ও পাঠকের মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের বৈচিত্র্য অনুসারে মানবিক অনুভূতিমূলক নাটককে দু'টি বিভাগ করা হয়েছে। যথা;—নারীর মানবিক মহিমা প্রচারমূলক ও বাঙালী গার্হস্থ্য জীবন বা সমাজ জীবনের মানোন্নয়নের নীতি উপদেশমূলক ।

প্রথমে নারীর মানবিক মর্যাদা প্রচারমূলক বিভাগটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে । উনিশ শতকের নবজাগ্রত ভাবপ্রবাহে যুগচিন্তা নায়কগণ অনুভব করেছিলেন যে, জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন চাইলে ও বিদেশীদের নিকট দেশের লজ্জা নিবারণ করতে হলে নারীকে তার মানবিক মর্যাদা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। অথচ সমকালে পুরুষের নিকট নারী দাসী বা সেবিকা মাত্র। পুরুষের আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মতো নারীও একটি উপকরণ মাত্র। যুগচিন্তা নায়কগণের সঙ্গে সমকালের নাট্যকারগণও এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। নাট্যকারগণ নারীকে মানবিক মর্যাদা প্রদান বিষয়ক একাধিক নাটক লিখলেন । এ বিষয়ে 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'নবনাটক' ও 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায় ।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫২) রামনারায়ণ তর্করত্নের রচনা। নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ সেকথা স্বীকার করেছেন। নাটকটি মূলত কুলীন নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিকথা। সমাজে কুলীন নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের বিনিময়ে কুলরক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকে যুগচিন্তা নায়কগণ এই রীতিকে একটি ভ্রান্ত নিয়ম বলে মনে করলেন এবং কুলীন পুরুষের একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করলেন। কুলীন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীর যন্ত্রণার বিনিময়ে কুল রক্ষার ভ্রান্ত নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটির 'বিজ্ঞাপন'-এ রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরীর উৎসাহের কথা স্বীকার করেন। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন;—

"বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন—কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণমধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" (৪৫)

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি রচনার পিছনে সেকালের হৃদয়বান ব্যক্তির উৎসাহ রয়েছে। এ বিষয়ে নাট্যকার ভূমিকায় 'ভাস্কর' পত্রের একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করেন। তাছাড়া নাট্যকার কুলীন রমণীর দুর্দশায় মর্মাহত ছিলেন, এই সংবাদটিও 'বিজ্ঞাপন'-এ রয়েছে। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখেছেন;—

"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্তই অভিলাষী ছিলাম;" (৪৬)

এখানে কুলীন নারীর অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কাতর নাট্যকারের দর্শকের মনে সহানুভূতি জাগাতে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' রচনা করার পরিকল্পনাটি জানা গেল।

নাটকখানি সেকালে সর্বোৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃত হয়। নাটকটির কাহিনী এই রকম;—সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ কুলপালকের চার মেয়ের কুলীন পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে না পারলে কুল রক্ষা হচ্ছে না। এক কপট ঘটকের প্রচেষ্টায় ষাট বছরের ঊর্ধ্বে এক কুলীন পাত্রের সন্ধান মেলে। কুলপালক কুলীনপাত্রের হাতে চার মেয়েকে সম্প্রদান করে। নাটকটির অভিনয় দেখলে কিংবা পাঠ করলে সহৃদয় ব্যক্তি আহত হতে বাধ্য। কেননা, পাত্রটি পূর্বেই একাধিক বিবাহিত। বিবাহ ব্যবসায়ই পাত্রের কাজ বা জীবিকা। সে কুলপালকের চার মেয়েকে একসঙ্গে বিয়ে করেছে। যাদের বয়স যথাক্রমে ৩২-৩৩, ২৬-২৭, ১৪-১৫ ও প্রায় ৮ বছরের একটি শিশু। প্রথম তিনজন না হয় বিয়ে কি—সে সম্বন্ধে জানে। কিন্তু শিশু কন্যাটির বয়স মাত্র আট বছর, যার স্বামীর বয়স ৬০ বছর। যে শিশুটি বিয়েকে একটি ভাল খাবার হিসাবে মনে করে। এরকম একটি শিশুর বিয়ে দিয়ে কুল রক্ষার ভ্রান্ত আচার 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-এ পাওয়া যায়। তাছাড়া নাট্যকার দেখিয়েছেন, কুলীন নারীর কাছে স্বামীপ্রেম অনেকটা স্বপ্নের মতো। কেননা বিবাহ ব্যবসায়ী স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে রেখে দেয়। এবং পরবর্তীকালে পিতৃগৃহে স্বামী বিরহে অনেকসময় পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি দেশীয় নারীর যন্ত্রণাময় একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যা পাঠক ও দর্শকের মনে নারীর প্রতি সহানুভূতি জাগাতে সাহায্য করে।

রামনারায়ণের আর একটি বিখ্যাত নাটক 'নবনাটক'। সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ-পরিবারের কর্তার বহু বিবাহের ফলে পরিবারটি কিরূপ নিঃস্ব ও ছন্নছাড়া হয় তারই নীতিশিক্ষামূলক নাটক 'নবনাটক'। নাটকে দম্ভাচার্য, চিত্ততোষ, বিধর্ম বাগীশ প্রমুখ জমিদার গবেশের স্তাবক ও প্রাচীনপন্থী। অন্যদিকে সুপণ্ডিত সুধীর, নাগর প্রমুখ উদার ও নিরপেক্ষ মত-পথের সমর্থক। সেজন্য সুধীর প্রমুখ বহুবিবাহ নিবারণী সভার সক্রিয় সদস্য তথা কর্মী। এরা জানে, বহু বিবাহ একটি কুপ্রথা, এর অবসান প্রয়োজন । জমিদার গবেশবাবু বহুবিবাহে উৎসাহী হলে সুধীর তাকে বহুবিবাহ না করার পরামর্শ দিয়েছিল। নানা শাস্ত্রীয় যুক্তির পর সুধীর বলে;—

> "যিনি বহুবিবাহ করেছেন এই সুখময় সংসার তাঁর কখনই সুখে নির্বাহিত হয় নাই, গৃহকন্দল-কুজ্ঝটিকাতে দিবানিশি তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে, সচ্চরিত্র লোকও অসচ্চরিত্র বলে লোকসমাজে পরিগণিত হয়ে গেছেন, ..." (৪৭)

কিন্তু জমিদার সৎ পরামর্শে কান না দিলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। জমিদারিতে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়, প্রথমপত্নী সাবিত্রী আত্মহত্যা করে, জমিদার স্বয়ং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহত্যাগ করে । অর্থাৎ সুখশান্তিতে পূর্ণ সমৃদ্ধ একটি পরিবার বহুবিবাহের অভিশাপে নিঃস্ব ও ছন্নছাড়া হয় ।

'নবনাটক' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন স্বীকার করেন যে, 'যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী' তাঁর ওপরে এরকম একটি নাটক রচনার ভার অর্পণ করে। নাট্যকার নাটকটির বিষয় সম্বন্ধে 'উপহার' পত্রে বলেন;—'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।" (৪৮) 'নব নাটক'-এর উদ্দেশ্য যে সমাজ সচেতন করা, তা 'উপহার' অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আসলে নাট্যকার সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা নিবারণ করার আন্তরিক প্রয়াস নেন। বলা যায়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টা দর্শক তথা পাঠকের মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদন। নাটকের গৌরচন্দ্রিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে । সূত্রধার তার প্রিয়াকে বলে;— "...এ অতি সুবিজ্ঞ সমাজ, এ সমাজে সদুপদেশ-পূর্ণ কোন বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করতে হবে।" (৪৯) এবং নাটকের শেষে সূত্রধার পুনরায় বলে;— "...সভ্য মহোদয়বর্গ ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গণেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন ?" (৫০)

—অর্থাৎ এদেশের বহুবিবাহের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে নারীর পূর্ণ মানবিক মর্যাদা প্রদান করে সংসার ও সমাজের সমৃদ্ধি ও শান্তি বর্ধনের ইঙ্গিতমূলক নাটক 'নবনাটক'।

উমেশচন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশের বিধবা নারীর দুঃখ নিবারণের জন্য বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়েন। 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি সেই মহৎ

কর্মের সমর্থনে রচিত। বলা চলে, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে যুক্তি দেখিয়েছেন, সেই দার্শনিক বা শাস্ত্রীয় যুক্তি বা তথ্যের রসময় নাট্যরূপ 'বিধবা বিবাহ'। নাটকটি বিধবা বিবাহের পক্ষে এদেশের হৃদয়বান মানুষের কাছে আবেদনমূলক গ্রন্থ।

কীর্তিরাম নিছক সংকীর্ণ ধারণায় প্রভাবিত হয়ে বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যার কঠোর জীবন যাপন সমর্থন করে। সে বিধবা বিবাহ নামক ব্যবস্থাটির প্রতি ক্ষুব্ধ। যারা বিধবা নারীর মনের খবর না রেখে বিধবাকে একাদশীর ব্রতপালনকারী মহিলা বলে মনে করে,—তাদের প্রতিনিধি কীর্তিরাম ঘোষ। প্রতিবেশী শ্যামাচরণ মিত্র বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাঁর মতে সমাজে বিধবার পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা না থাকলে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। যা সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। সমাজে প্রগতি আনতে হলে বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ প্রথা প্রচলন জরুরি। তাই 'বিধবা বিবাহ' নাটকে বিধবা কন্যার বিবাহ বাসরে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

অন্যদিকে কীর্তিরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিধবা সুলোচনা, প্রতিবেশী যুবক মন্মথের সঙ্গে অবৈধ দেহ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পরিশেষে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার বিয়োগান্তক পরিণতিই মধ্যযুগীয় মানসিকতার কীর্তিরামকে সচেতন করে। নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র এরকম একটি বিয়োগান্তক কাহিনীর দ্বারা সহৃদয়বান মানুষের অন্তরে সহানুভূতি জাগাতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকের বাঙালী-নাগরিক জীবন ছিল অভিনব। নতুন যুগে নতুন জীবনযাত্রায় শুভ ও অশুভ উভয় দিকই ছিল। যা সমাজের পক্ষে অশুভ তা সমাজ হিতৈষীর নিকট ভীষণ কষ্টদায়ক। সেই সমাজ হিতৈষী যদি লেখক হন, তাহলে তাঁর লেখায় সমাজ পতনের জন্য অনুশোচনা ও তা থেকে মুক্তির সদুপদেশ থাকবে। এই সময়ের কলকাতার নাগরিক জীবনে ছলচাতুরী, স্বার্থপরতা, কুটকুশলতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলি বাঙালী জীবনের পূর্ণ মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত নাগরিক জীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থপর মনোভাব গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই শান্তিহীনতার জন্য সমকালের বাংলা নাটকে অনুশোচনা ব্যক্ত হয়েছে; আবার শুধু অনুশোচনাই নয়, তা থেকে মুক্তির সদুপদেশও রয়েছে।

আমরা নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক থেকে সমকালীন গার্হস্থ্য তথা পারিবারিক জীবনের চিত্র অনুসন্ধান করব। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধে সামাজিক নাটকের বিষয়ে বলেন;—

> "দোষ-গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্‌সুলীর

জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্রহীন হইয়া দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে;" (৫১)

গিরিশচন্দ্র যে দোষগুণগুলির নির্দেশ করলেন, সেগুলি বাঙালীর নাগরিক জীবনের দোষগুণ। তিনি এই সব দোষ গুণগুলিকে নিয়ে সামাজিক নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক লেখা ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য— পাঠক ও দর্শককে নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করা। তিনি 'নটের আবেদন'-এ বলেন;—"...সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি-মার্জ্জিত করিব" (৫২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাঠক তথা দর্শককে নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা প্রদান ও রুচি মার্জিত করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। আমাদের আলোচ্য সামাজিক নাটকে বাঙালীর পারিবারিক তথা গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানারকম নীতিকথা ও উপদেশের পরিচয় পাব।

প্রথমে 'প্রফুল্ল' (২২ আগষ্ট, ১৮৮৯) নাটকের আলোচনা করা যাক্। নাটকের প্রধানচরিত্র যোগেশ, ত্রিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে পিতৃহীন একটি নিঃস্ব সংসারকে সমৃদ্ধ করে। কনিষ্ঠ দুই ভাই রমেশ ও সুরেশকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছে, মাকে কাশীতে পাঠিয়ে মায়ের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। নাটকের সূচনায় আমরা দেখব, পরিবারটি সুখী ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উমাসুন্দরী জ্যেষ্ঠ পুত্র-বধূকে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছে;— "তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েচি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমা হ'তে আমার ঘর ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।"(৫৩) কিন্তু সুখ শান্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে যোগেশ নিঃস্ব হবার সংবাদ পেয়েছে। যোগেশ এরকম আঘাত পাওয়ার জন্য তৈরী ছিল না, তবুও কিছু সময় পরে হয়ত স্বাভাবিক হত। কিন্তু রমেশের ছল চাতুরী তার 'সাজান বাগান'কে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এমন সময় কনিষ্ঠ ভাই সুরেশের প্রতি চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগ, রমেশের জোচ্চুরীকে মা এবং স্ত্রীর সমর্থন, তাকে দিশাহারা করে তোলে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিঃস্বতার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক নিঃস্বতাকে যোগেশ মেনে নিতে পারে নি। তাই সে হতাশার সঙ্গে বলে — আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

যোগেশের পরিবারে পতনদশার সূচনা ব্যাঙ্ক ফেলের কারণে হলেও সেটি মুখ্য নয়। ব্যাঙ্ক ফেলের দুঃসংবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। কেননা ব্যাঙ্ক ফেল যে হয় নি সে সংবাদও যোগেশকে দেওয়ার জন্য লোক এসেছিল। আসলে যোগেশের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী সমকালের নাগরিক-ব্যক্তিস্বার্থ। রমেশের মধ্যে

এই ব্যক্তিস্বার্থ সক্রিয়। রমেশ শিক্ষিত ও পেশায় উকিল । তার কাছে ছলাকলার দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা সাধারণ ব্যাপার । তার মতো মানুষের কাছে মানবিকতার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থই বড় । রমেশের ব্যক্তিস্বার্থের নিকট পিতৃতুল্য দাদা, মা ও মাতৃতুল্য বৌদি, নিষ্পাপ ফুলের মতো ভাইপো এবং স্ত্রীর মানবিকতাবোধ নিতান্ত তুচ্ছ । দেবতুল্য দাদা তার নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি যখন ছোট ভাই দুটিকে সমান অংশ দিতে চেয়েছিল, তখনই রমেশের মনে দুরভিসন্ধি জেগে উঠে। রমেশ স্বার্থপরের মতো বলেছে;—"যা'তে পরের অপকার, তা'তে আপনার উপকার । ভাইয়ের চেয়ে পর কে ? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু!" (৫৪)

আসলে উনিশ শতকে বাঙালী নাগরিক জীবনে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের বিকৃত বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ উক্ত সময়ের বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের এই বিয়োগান্তক অধ্যায়কে 'প্রফুল্ল' নাটকে ফুটিয়েছেন । বাঙালীর সহজ, নিঃস্বার্থ, কপোট হীন যৌথপরিবারের সুবর্ণ দিনগুলির অবসান চিত্র 'প্রফুল্ল' নাটকে পাওয়া যায়। নাটকটি পাঠ করলে কিংবা অভিনয় দেখলে পাঠক ও দর্শক সমকালের ব্যক্তিস্বার্থ জর্জরিত সমাজের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হবেন । আমরা জানি, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাঠক ও দর্শককে ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য কলম ধরেছেন। অতএব বলা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটক পরিকল্পনার পিছনে নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমকালীন ব্যক্তিস্বার্থ জর্জরিত সমাজকে যৌথপরিবারের সহজ, সরল ও নিঃস্বার্থ কপোটহীন জীবনযাপন করে শান্তি লাভ করার জন্য আহ্বান জানান ।

'প্রফুল্ল'-এর মতো 'হারানিধি'ও (১৪ই জুন ১৮৯০) গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। এই নাটকে পরোপকার ধর্ম, বিপদে ধৈর্যশীল হওয়া, অর্থ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে সৎপরামর্শ আছে । নাটকটিতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সৎপরামর্শ বাঙালীর সমাজ জীবনের মানোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল ।

মানুষের অর্থলালসার প্রবৃত্তি অনেকসময় ভয়ানক হয়ে উঠে । সেই অর্থলালসা পরিবার ও সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে । 'হারানিধি' নাটকে মোহিনীমোহনের অর্থলালসার নিকট দয়া, মায়া, বন্ধুত্ব, সমস্তই তুচ্ছ । সে তার স্ত্রীকে বলেছে;—

> "দয়া, ধর্ম্ম, শাপ, মন্নি এসব যদি মনে ছিল, বড়লোকের ঘরে এলে কেন ? তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয়, জান না, ...ক্রোড়টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয় ? গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা শাসন কর্‌তে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয়-কেড়ে নিতে হয়, তবে বড়লোক হয়।" (৫৫)

মোহিনীমোহনের ধারণা ধনাঢ্য হওয়ার উপায় নানা কৌশলে অর্থশোষণ করা । যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি দেশের মঙ্গলের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের সে 'আহাম্মক' বলেছে । তার ভাষায়;—"হাঁ হাঁ, আছে বটে — আছে বটে । তুমি যে রকম বল্‌চ, দু'ট একটা আহাম্মক আছে বটে; ...পরোপকার এক ঢেউ।" (৫৬) মোহিনীর কাছে মানুষ ও কুকুর বেড়ালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সে বলে;—"কার সর্ব্বনাশ হয়, কে মরে, কার অন্ন জোটে না, তা ধর্‌তে গেলে বড়লোকের বিষয় রক্ষা করা হয় না। তোমরা কি কুকুর-বেরাল, শুওর-গাধা খেতে পেলে কি না, দেখ? (৫৭) মোহিনীর অর্থলালসা তার সমস্ত মানবিক গুণগুলিকে দমিয়ে রেখেছে । অর্থাৎ 'বড়লোক' বা ধনাঢ্য হতে গেলে মানবিকতাকে বিসর্জন দেওয়া উচিত,—এমন একটি বিকৃত মনোভাব মোহিনীমোহনকে চালিত করেছিল । এই মনোভাব যে পরিবার ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, তা নাটকে মোহিনীমোহনের মনোভাব পরিবর্তনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত । সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলেছে;—

> "...অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছি, ...যার অর্থ নাই, অর্থ কি বিষময় পদার্থ, সে জানে না । অর্থে কেবল অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক, দুর্ব্বলপীড়ন প্রথম শিক্ষা দেয় । অষ্টপ্রহর মনকে উপদেশ দেয়, 'সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর!' এই অর্থের প্রতারণায় যে প্রতারিত না হয়, সে সাধু, আমি মত্ত হয়েছিলুম।" (৫৮)

পরোপকার পরম ধর্ম, এই নীতি শিক্ষা 'হারানিধি' নাটকে স্পষ্ট । হরিশ মোহিনীর বন্ধু । সে যথাসর্বস্ব দিয়ে বন্ধুর উপকার করেছিল । কিন্তু মোহিনীমোহন বন্ধু হরিশের সরলতার সুযোগ নিয়ে সর্বস্ব হরণ করতে চেয়েছিল । সেজন্য হরিশ অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে বলেছে;—

> "হ্যাঁ হে, তুমি কি সব ভুলে গেলে? তুমি সাঁতার দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমায় বাঁচাই; তোমার মার গহনা চুরি করেছিলে, তোমার বাপ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়,—আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই; তোমার কষ্ট হবে ব'লে বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুরে শুই; হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা করেছিলে, তোমায় বাঁচাবার জন্য হাড়ীর লাঠি খেয়ে ছ মাস শয্যাগত হই; ...আমি বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর তুমি গলায় ছুরি দিচ্চ? (৫৯)

হরিশ বন্ধুর অর্থলালসায় নিঃস্ব হয়েছে। মোহিনীমোহনের বিপদগ্রস্ত কন্যাকে হরিশের স্ত্রী হৈমবতী ও কন্যা সুশীলা সেবা শুশ্রূষা করেছিল। হৈমবতী ও সুশীলার নিয়মিত মোহিনীমোহনের বাড়িতে যাওয়াকে হরিশ সন্দেহ করে। সুশীলা বুঝতে পেরে পিতা হরিশকে বলেছিল;—

> "কে আমার কথা ফুটতে ফুটতে শিখিয়েছিল, পরোপকার পরম ধর্ম্ম? কে আমায় শিখিয়েছিল, শত্রুকেও স্নেহ করবে; কে আমায় শিখিয়েছিল, অনাথাকে আশ্রয় দেবে? কে আমায় শিখিয়েছিল, পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?" (৬০)

অর্থাৎ শত্রুকে স্নেহ করা, অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, এমনকি পরোপকারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করা যে মহৎ ধর্ম— এবিষয়ে নীতিশিক্ষা এখানে স্পষ্ট ।

মানুষের জীবনে বিপদ আসবেই । বিপদে বিভ্রান্ত হলে আরো বিপদ, কিন্তু সাধারণ মানুষ বিপদে বিভ্রান্ত হয়ে বিপদকে জটিল করে তোলে । 'হারানিধি' নাটকে বিপদে ধৈর্যশীল হওয়ার সৎ পরামর্শ আছে । নীলমাধব অত্যন্ত ধৈর্যশীল । বিপদে কাতর অত্মহত্যায় উদ্যত কাদম্বরীকে সে বলেছে;—

> "...আমার কি দুরবস্থা, তুমি জান না, আমার পিতা বিশ্বাসঘাতকের ছলে প্রতারিত হয়ে উদ্‌বাস্তু হয়েছেন, আজ তাঁর পিতা-পিতামহের ভিটে ত্যাগ ক'রে যাবেন; আমি বৃত্তিহীন, কাল্‌কের সংস্থান নাই, দুখিনী মার গহনা বেচে উদরান্ন কর্‌তে হবে; বিধবা ভগ্নী, আমি সংসারের একমাত্র আশ্রয়, কিন্তু দেখ, আমি কাতর নই।" (৬১)

নীলমাধব বিপদের দিনেও স্থির। সে বিভ্রান্ত না হয়ে বিপদকে অতিক্রান্ত করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে । পিতা হরিশ বলেছে;— "...আমি দুর্ব্বল, বিপদে কাতর হয়েছিলুম, কিন্তু তোমরা লোকশিক্ষা দিলে, বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্যশীল হ'তে হয়।" (৬২) অর্থাৎ হরিশ বলতে চেয়েছে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও ভাই বিপদের দিনে কাতর না হয়ে বরং বিপদ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে । এই প্রচেষ্টা সমাজজীবনের কাছে আদর্শস্বরূপ, যার থেকে মানুষ শিক্ষা পেতে পারে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এখানে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য, সমাজের দোষ গুণের অবতারণা দ্বারা সমাজকে সৎ পরামর্শ দিতে চেয়েছেন ।

'মায়াবসান' (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮) গিরিশচন্দ্র ঘোষের নীতি-আদর্শমূলক আর একটি সামাজিক নাটক । আমরা সমাজজীবনে কোন না কোন কিছুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি । যশ, অর্থ, লোভ প্রভৃতি স্বার্থ আমাদের চালিত করে। 'মায়াবসান' নাটকে যশ, অহংকার, লোভ প্রভৃতিকে মায়া বা ভ্রম বলা হয়েছে । সমাজকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করতে হলে এসবের উৎপাটন জরুরি । 'মায়াবসান'-এ তারই নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে । আমরা নাটকে দেখব কালীকিঙ্কর একজন মহৎ ব্যক্তি । তিনি পরহিতৈষী । তবুও তাঁর মনে শান্তি নেই । কেননা তিনি পরহিত ব্রত গ্রহণ করলেও ফলকামনা ত্যাগ করেন নি । ফলের মায়া বা মোহ তাঁকে পরিচালিত করেছিল । কালীকিঙ্কর তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে বলেছেন;—

"...আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জানো ? মুখে ব'ল্‌তেম— নিষ্কাম ধর্ম্ম-নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত ক'রেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক'র্‌তে পরহিত ক'রেছি, আত্মোন্নতির জন্যে পরহিত ক'রেছি, ফল-কামনায় পরহিত ক'রেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পর-কার্য্যে রইলেম;..." (৬৩)

নাটকের শেষে কালীকিঙ্করের ফলের মায়াবসান হয়।

যাদব ও মাধব দুই ভাই। এরা সম্পত্তির লোভে ভ্রাতৃসংঘাতে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এদের সম্পত্তির লোভ বা মায়া সমৃদ্ধ পরিবারটির শান্তি ছিনিয়ে নেয়। দুই ভাই অবশেষে বুঝতে পেরেছিল, সম্পত্তির লোভে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করাটা অন্যায় হয়েছে। সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে দুই ভাইয়ে ভ্রাতৃপ্রেম কামনা করেছে। যাদব বলেছে;—"দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ ক'র্‌তে পার্‌বে না।" (৬৪)

গণপতি মনে করত, অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিলে সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মেমকে বলে;—"আজ্ঞা মেম সাহেব, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে, সত্য একটা কথার কথা," (৬৫) অর্থাৎ 'মায়াবসান' মিথ্যা মায়া বা মোহকে অতিক্রম করে প্রকৃত সত্যকে চেনার নীতিমূলক নাটক।

আমরা লক্ষ করব, 'মায়াবসান' নাটকের কাহিনীতে বিপদে স্থির থাকা, অসৎ চিন্তা মনে স্থান না দেওয়া, কর্তব্যপালন, পতিভক্তি, স্বদেশ উদ্ধারের পথাদর্শ, ক্ষমাপরায়ণ হওয়া ও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের মতো অনেকগুলি নীতি উপদেশ রয়েছে।

কালীকিঙ্কর ও অন্নপূর্ণার চরম বিপদের দিনে, রঙ্গিনী হলধরকে বলেছে;—"...আমার ধর্ম্ম বল, সত্য বল, কৃতজ্ঞতা বল, আমার ইষ্ট-সেবা, মাতৃ-সেবা বল, এ সামান্য বিপদ্‌কে আমি ভয় করি না;" (৬৬) রঙ্গিনী তার ধর্মবল, সত্যবল, কৃতজ্ঞতা বল প্রভৃতি মহৎ শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে স্থির ও ধৈর্যশীল। যাদব ও মাধব বিপদগ্রস্ত হয়ে পিতৃসম কাকা কালীকিঙ্করের নিকট ক্ষমা চেয়েছিল। তারা বাঁচতে চেয়েছিল, কালীকিঙ্কর বলেছে;—

"... আমার চিরদিন ধারণা, মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না; সত্যের সংসার-সত্যপথই নিরাপদ্ পথ। ...শিক্ষা কার নাম জান ?—যে পথে অধঃপতিত হ'য়েছ, সে পথ থেকে ফেরা; যে কুকাজ ক'রেছ, তার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অনুতাপ করা। দণ্ডের ভয়ে না, পুলিসের ভয়ে না।" (৬৭)

একথা যেন চিরন্তন সত্য। কেননা অপরাধীর মনে অপরাধবোধ বা অনুশোচনা না জাগলে পুনরায় সে অপরাধ করতে পারে। তাই বলে আদর্শ সমাজে ক্ষমা থাকবে না, তা নয়। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন মার্জনা বা ক্ষমা পেলে পরম শান্তি পাওয়া যায়। এতে ক্ষমা-দাতার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদব ও মাধবের দুষ্টমতীকে কালীকিঙ্কর শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। তিনি বলেন;—"মার্জ্জনাই-মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।"(৬৮) সংসারের কর্মপথ অত্যন্ত কঠিন, সে পথে অনেক কষ্ট থাকে। কালীকিঙ্কর বাস্তব সংসারের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উদভ্রান্ত জীবনাচরণ করলে, রঙ্গিনী বলে;—"তোমার যন্ত্রণার ভয়, তাই তুমি আরাম হ'চ্ছ না, কিন্তু তোমার শিক্ষায়—আমার যন্ত্রণায় ভয় নাই, যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।" (৬৯) এখানে বাস্তব সংসারের কঠিন কর্মপথকে বরণ করার জন্য রঙ্গিনীর আহ্বান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মবিমুখ হয়ে জীবনযাপন নয়, কর্মময় জীবনের পরম আনন্দ রঙ্গিনী পেয়েছে। সেজন্য রঙ্গিনী সত্য, ধর্ম ও পরোপকারকে জীবনের ব্রত বা কর্তব্য মনে করে। শ্বশুর কালীকিঙ্করকে হত্যা করার মিথ্যা অভিযোগে অন্নপূর্ণা অপরাধী। আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। পুলিশ তাকে ধরতে এলে সে নিজেকে আড়াল করে বাঁচতে পারত। কারণ পুলিশই তাকে সে সুযোগ দিতে চেয়েছে। কিন্তু অন্নপূর্ণা পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় নি। বরং পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছে। তার ভাষায়;—"... রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্ত্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমায় পুলিসে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পালিয়ে থেকে অনুমতিলঙ্ঘনের চেষ্টা ক'র্‌বো না। রাজার উপর ভগবান্ বিচারের ভার দিয়েছেন।" (৭০) অন্নপূর্ণা চরিত্রের দ্বারা ভারতীয় নারীর স্বামী-ভক্তির চরম আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। অন্নপূর্ণা মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরের নাম মুখে আনতে পারে নি। কেননা, ঈশ্বরের নামে তার স্বামীর নাম। অন্নপূর্ণা বলে;—"আমার ও নাম মুখে আন্‌তে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম ক'র্‌তে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখ্‌তে হয়।' (৭১) বিন্দু বলে, এরকম সতীসাধ্বীর শিয়রে স্বয়ং বিষ্ণু পতিরূপে বসে আছেন। আমরা লক্ষ করব, অন্নপূর্ণা, জগৎপতিকে স্বামীর আসন দিতে নারাজ। সে বলেছে, তার স্বামী ঈশ্বরের তুলনায় যত ক্ষুদ্রই হোক্, তবু সে স্বামী। তার ভাষায়;—"না, না, বিষ্ণু নন, তিনি— তিনি।" (৭২) এই বক্তব্যের পর অন্নপূর্ণার স্বামী-ভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যে স্বামী-ভক্তি সংসারকে শান্তির কুঞ্জে পরিণত করতে পারে। এই নাটকে উনিশ শতকের স্বদেশের জন্য কয়েকটি পরামর্শ পাওয়া যায়। 'মায়াবসান' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কালীকিঙ্কর বলেছেন, এদেশে ধর্মীয় একতা স্থাপনের কথা। তাছাড়া দেশের মুক্তির জন্য সচেতন মানুষের উচিত সাধারণ মানুষকে সুনীতি শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ ও ইংরেজদের অনুকরণে চলতে গিয়ে দেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি না করার উপদেশের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটিতে আর একটি মহৎ আদর্শ রয়েছে, তা হল—গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব। কালীকিঙ্কর বলেন, আত্মত্যাগ করতে হবে। সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ

করে জগৎ ও জীবনের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তাকেই বলা হয় নিষ্কাম ধর্ম। এই নিষ্কাম ধর্মপথ ভিন্ন সমাজ ও দেশের পরিপূর্ণ মঙ্গল নেই। 'মায়াবসান' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জগৎ ও জীবনের প্রতি মিথ্যা আসক্তি বা মায়া ত্যাগ করে সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ হবার মহৎ আদর্শের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় বাংলা নাটক ঃ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রগতিশীল বাঙালী ইউরোপীয় সংস্পর্শে থাকাকেই শ্রেয় মনে করতেন। এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুদার লিখেছেন;—

> "বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায় প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে ভারতে পাঠাইয়া হিন্দুদিগকে নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন... প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বলিয়াছেন, ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও না ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলিয়া গ্রহণ করিব।" (৭৩)

কিন্তু এই মোহ অচিরেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায়। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারই বলেন;—

> "উনিশ শতকের প্রথমে জাতীয়তাভাবের জাগরণের পূর্বে হিন্দু নেতাগণ মুসলমান শাসনের পরিবর্তে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন,... কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইল।" (৭৪)

কেননা, ইংরেজ শাসকের দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয়দের বঞ্চনা করত। প্রসঙ্গত ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি আইনের কথা বলা যায়। ইতিহাসে যা 'কালো আইন' নামে পরিচিত। পূর্বে আইনে ছিল, ইউরোপীয়দের বিচার সুপ্রিম কোর্টেই হবে। এতে গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর ইউরোপীয়দের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ অত্যাচারী ইংরেজকে শাস্তি দিতে হলে সাধারণ মানুষকে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। যা তাদের সাধ্যের বাইরে। বেথুন সাহেব এই আইনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। যাতে মফস্বলের সাধারণ মানুষ সুবিচার পায়। প্রবল বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত নতুন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এতে শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী অসন্তুষ্ট হয়। ইংরেজগণ এই নতুন আইনকে 'কালো

আইন' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া ইংরেজ শাসকের বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সিপাহী বিদ্রোহী হয়ে উঠে । যা সিপাহী বিদ্রোহ বলে পরিচিত । এর কিছু পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় নীলচাষী নীলকর সাহেবের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। উনিশ শতকে এরকম আরো অনেক বৈষম্যমূলক ঘটনা আছে । অতএব উনিশ শতকের মধ্যভাগেই শিক্ষিত বাঙালী, সিপাহী, চাষী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক সময় অসন্তুষ্ট ও কখনো বিদ্রোহী হয়েছিলেন । জাতীয়তাবাদী আবহাওয়াকে আরো ব্যাপকতা এনে দেয় হিন্দুমেলা (১২৭৩ বঙ্গাব্দ) । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে বলেছেন;—

> "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন । ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয় । মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত "মিলে সবে ভারতসন্তান" রচনা করিয়াছিলেন । এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" (৭৫)

এই হিন্দুমেলাও শিক্ষিত সচেতন মনে দেশানুরাগ সৃষ্টিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে । এমন সময় বাংলা নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন । তবুও মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী নাটকের অভাব দূরীভূত হয় নি। অনেক নাট্যকার নাট্যসাহিত্যে বাঙালীর সমকালের জাতীয় ভাবনাকে স্থান দিয়ে নতুন করে নাটক রচনায় হাত দেন । ফলে জন্ম নেয় জাতীয় চেতনা সমৃদ্ধ বাংলা নাটক । এই নাটকগুলি জাতীয়তাবাদী নাটক বলেই পরিচিত। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য জাতীয়তাবাদী নাটকের দু'টি শ্রেণী করা হয়েছে । যথা; ঐতিহাসিক নাটক ও আর্থ-রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ নাটক ।

প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করা হবে । বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১); রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাটকটির সৃষ্টিই যেন সমকালের স্বাজাত্যবোধকে নির্দেশ করে। মধুসূদন দত্ত 'রিজিয়া' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক লেখার অনুরোধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু এবিষয়ে লিখেছেন;—

> "মধুসূদন ইহার পর সম্রাট আলটামাসের দুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর — একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশববাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক

সাধারণ হিন্দু দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া 'রিজিয়া' সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 'রিজিয়া'র পরিবর্ত্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশববাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন।" (৭৬)

এখানে ইতিহাস অবলম্বনে নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। মধুসূদন নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য স্বজাতীয় ইতিহাস অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পরামর্শদাতার বিশ্বাস ছিল, বাঙালী দর্শকের নিকট রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসের অভিনয় দর্শন অবশ্যই জনপ্রিয় হবে। কেননা সমকালের শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত ছিল। অতএব বলা যায়, স্বাজাত্যচেতনায় সমৃদ্ধ এই নাটক বাঙালীকে স্বাজাত্যবোধে জাগ্রত করবে।

মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে দেশানুরাগকে প্রকাশ করেছেন। আমরা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে স্বদেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ লক্ষ করব। ভারতবর্ষের সমকালীন দুরবস্থায় রাজা ভীমসিংহ মর্মাহত। তিনি স্বদেশের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করে বলেন;—

"ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! ...ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো? (৭৭)

এই বক্তব্য একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের। এখানে স্বদেশের দুরবস্থার জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে স্বদেশের মুক্তি যে আসন্ন; নাটকে সে কথাও বলা হয়েছে। তপস্বিনী বলেছেন;—"মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহ রূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পূণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? " (৭৮) উল্লিখিত কথোপকথনে স্বদেশের প্রতি সুগভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে; যা উনিশ শতকের সচেতন বাঙালীকে প্রভাবিত করেছিল। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—"মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ কৃষ্ণকুমারী নাটকে। ভীমসিংহের খেদে আমরা সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কথা শুনি।". (৭৯)

এই শ্রেণীর নাটক রচনায় আর যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা হলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। আমরা উনিশ শতকের ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করব। সে হিসাবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথা বলতেই হবে। অন্য ভাবে বলা যায়, উনিশ শতকে একাধিক ঐতিহাসিক নাটক লিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের রচনাকাল বিংশ শতকের গোড়ায়। সময়ের হিসাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি উনিশ শতকের রচনা নয়। সেজন্য এবার আমরা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলি আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার হিসাবে স্বনামধন্য। তবুও তাঁর পরিবারের কথা বলতেই হয়। তিনি ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ-উপনিষদের আদর্শে স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—

> "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশীয়ভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।"(৮০)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দুমেলা, সর্বোপরি ঠাকুর পরিবারের গঠনমূলক পরিবেশে মানুষ হওয়ায় অকৃত্রিম দেশানুরাগী হয়ে ওঠেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেন;—

> "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।" (৮১)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক নাটকে বীরত্বগাথা ও ভারতের অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে বক্তব্য বা প্রসঙ্গ দর্শক ও পাঠকের মনে দেশানুরাগ জাগাতে সমর্থ হয়েছে— সে বিষয়ে আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' (৯ই জুলাই ১৮৭৪)। দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট ভারতবর্ষে এসে পুরুর দ্বারা যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুধু বাধাপ্রাপ্তই নয়, পুরুর সাহস ও বীরত্বে স্বয়ং আলেকজাণ্ডার বিস্মিত ও মুগ্ধ। প্রাচীন ভারতের এরকম গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক কাহিনীকে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

'পুরুবিক্রম' নাটকটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমাদের মনে হয়েছে এই জনপ্রিয়তার পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল নাটকের কাহিনীর খোলসে নীতি ও উপদেশাবলী। নাটকটি পাঠ করলে কিংবা অভিনয় দেখলে মনে দেশানুরাগ সঞ্চারিত হবে। আমরা 'পুরুবিক্রম' নাটকটির নীতি উপদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা; ১। দেশানুরাগের প্রতি নিষ্ঠা।

২। দেশসেবায় পরোক্ষে উৎসাহ।

'পুরুবিক্রম' নাটকে পুরু, ঐলবিলা, উদাসিনী গায়িকা প্রমুখ স্বদেশপ্রাণ চরিত্র। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে এঁদের নিষ্ঠার অভাব নেই। মাতৃভূমি বিদেশী শত্রু সেকন্দরশার দ্বারা আক্রান্ত। এ যেন জাতীয় কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মোচনের জন্য ঐলবিলার উদ্যোগে সমস্ত রাজকুমার একত্র হয়েছেন। পুরুও সেই গোষ্ঠীতে আছেন। পুরু রাজকুমারী ঐলবিলাকে বলেছেন;—

> "আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? ...সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবনসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বলতে পারে যে, তারা ভারতবাসীগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।"(৮২)

পুরু রাজদূত এফেস্টিয়নকে মনে করিয়ে দেন;—

> "যবনরাজ সেকন্দর শা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ করছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? ...তাঁর এতদূর স্পর্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন?" (৮৩)

—নাটকটির নায়ক পুরু। পুরুর জীবনাদর্শে সুগভীর দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি স্বাধীনচেতা, বীর ও নির্ভীক। ক্ষত্রিয় জাতির কর্তব্য বিষয়ে সচেতন পুরু বলেন;—"লোককে কষ্ট হতে মুক্ত করবার জন্যই

ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাকাতে কখনোই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পারবে না।" [৮৪] পুরু তক্ষশীলাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন;—

> "লোকে সেকন্দর শাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর শা মনে কচ্ছেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি ? তখন তো তিনি পূর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু কী ভ্রম ! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি ।" [৮৫]

শুধু বীরত্ব বা নির্ভীকতাই নয়, নাটকে পুরুর ধর্মবোধও সমান উজ্জ্বল । সেকন্দরশার সৈন্য তাঁকে অন্যায় যুদ্ধে আহত করলেও তিনি বলেন;—"যবনগণ অন্যায় যুদ্ধ করুক, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে ।" [৮৬] পুরু জানেন, অন্যায় যুদ্ধ তিনি করছেন না । তিনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। তাছাড়া স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে ছলনার দ্বারা তুচ্ছ প্রাণ বাঁচাতে কোনরকম বীরত্ব বা ধর্ম নেই । সেজন্য পুরু উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

স্বদেশ রক্ষার জন্য ঐলাবিলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । নাটকের প্রথমেই ঐলবিলা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছেন । তিনি ঘোষণা করেন;—"যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমি তাঁরই পানিগ্রহণ করব।" [৮৭] আসলে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে চাই একতা । এই একতার ক্ষেত্রে কোনরকম আপোষ হলে জাতীয় ক্ষতি । তাই প্রথমে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য । এই ঐক্য রক্ষার জন্য ঐলবিলা উপরোক্ত ঘোষণা করেন । অবশ্য ঐলবিলা পুরুরাজকে ভালবাসে, তার স্থির বিশ্বাস পুরুই শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না, আবার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যও প্রতিষ্ঠা হবে । ঐলবিলার ভাষায়;—"আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন।" [৮৮]

'পুরুবিক্রম'-এর উদাসীনা গায়িকা দেশানুরাগের এক আদর্শ চরিত্র । উদাসীনা গায়িকা জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে দেশের সেবায় রত । গায়িকা বলেন;—"...আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি ; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।" [৮৯] তিনি আরো বলেন;—"আমি 'হোক ভারতের জয়' এই গানটি দেশে-বিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত । যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।" [৯০] গায়িকা দেশসেবায় একনিষ্ঠ কর্মী।

'পুরুবিক্রম' নাটকে দুটি গান আছে। প্রথম গানটি উদাসিনী গায়িকার কণ্ঠের ও দ্বিতীয় গানটি পুরুর কণ্ঠের। এই গান দুটি যেন নাটকের প্রাণ কেন্দ্র। প্রথম গানটি গায়িকার কণ্ঠে গীত হলেও গানটির একটি অন্য ইতিহাস আছে। গানটির গীতিকার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানটি গীত হয় হিন্দুমেলায়। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুমেলায় উপস্থিত শ্রোতার মনে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলা। গানটিতে প্রাচীন ঐতিহ্য, শৌর্য-বীর্যকথা ধ্বনিত হয়েছে। সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান আছে। দ্বিতীয় গানটিতে পুরু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এবার দেশসেবায় পরোক্ষ নীতি উপদেশের বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা লক্ষ করলাম, গায়িকা প্রমুখ চরিত্রের দেশসেবার একনিষ্ঠতার কথা। পুরু বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাতৃভূমির সম্মান বর্দ্ধিত করেছেন। নাটকটির রচনাকালে বাঙালী বিদেশী শত্রুর হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বহুদিন পূর্বে প্রাচীন যুগে সেকেন্দরশাহ বুঝেছিলেন ভারতবাসীও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। সমকালীন বাঙালী 'পুরুবিক্রমের' দ্বারা স্বদেশীয় বীর পুরুর বীরত্ব, সাহস ও স্বাধীনচেতা মনোভাবে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হবে। এই মুগ্ধতা বা বিস্ময় সমকালের কলঙ্কময় জাতীয় জীবনে পরোক্ষ প্রেরণা বা উৎসাহ দেবে একথা বলাই বাহুল্য।

'সরোজিনী' (৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকটিতে আল্লাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনী পাওয়া যায়। আমরা এই ঐতিহাসিক নাটকটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশানুরাগ বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের প্রশ্ন— যদি নাট্যকার দেশানুরাগ প্রকাশ করে থাকেন,—তা পাঠক ও দর্শককে কতখানি অনুপ্রাণিত করে।

'সরোজিনী'-এর স্বাধীন শান্তিপ্রিয় চিতোরের পরাধীনতায় আবদ্ধ হওয়ার বিষাদপূর্ণ কাহিনী পাঠক ও দর্শকের মনে সহানুভূতি ও অনুশোচনা জাগায়। চিতোর জয় করা আলাউদ্দিনের পক্ষে সহজ নয়। কেননা রাজপুতবীর লক্ষ্মণসিংহ, রণধীর ও বিজয় সিংহ চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একাত্ম হয়েছেন। আল্লাউদ্দিন এমতাবস্থায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মহম্মদ ভৈরবাচার্যের ছদ্মবেশ নিয়ে রাজপুত বীরবৃন্দের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করে। এবং চিতোরের সমস্ত সংবাদ বাদশা আল্লাউদ্দিনকে প্রেরণ করে। বাদশা আল্লাউদ্দিন রাজপুত বীরের অনৈক্যের সুযোগে চিতোর আক্রমণ করে। লক্ষ্মণ সিংহ, রণধীর, বিজয়সিংহ প্রমুখ বীরবৃন্দ অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর পরের দৃশ্য আরো মর্মান্তিক। রাজপুত রমণী তাঁদের সতীত্ব রক্ষার জন্য ও লম্পট বাদশার লোলুপ দৃষ্টি এড়াবার জন্য চিতা সাজিয়ে স্বেচ্ছায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এ এক মর্মান্তিক পরিণতি।

নাটকের শেষে রামদাসের গানে ভারতের পরাধীনতার বিয়োগান্তক পরিণতিই বড় হয়ে উঠেছে। চিতোরের সর্বত্র চিতা জ্বলছে, ধূম উঠছে, কোন সাড়াশব্দ নেই, বিজয় পতাকা ধূলিলুণ্ঠিত, মাতৃভূমি স্বাধীনতাহীন। এমতাবস্থায় রামদাস ভেবেছে;—

"তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন;
হয়ে পদানত দাস- ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন।" (৯১)

—মাতৃভূমি পরাধীনা; অতএব দাসবৃত্তির কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে রামদাসের কাছে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। রামদাসের এই মনোভাবে যেন একটি স্বাধীনচেতা জাতির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এ পরাধীনতা, সাধারণ পরাধীনতা নয় । দর্শক ও পাঠকের মনেও সুগভীর বেদনা ধ্বনিত হয় ও স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদের প্রতি মন আকৃষ্ট হয় ।

এ দিকে রাজপুত রমণীবৃন্দ ততক্ষণ জীবিত ছিলেন, যতক্ষণ দেশের স্বাধীনতা ছিল। মাতৃভূমির পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রমণী চিতা জ্বালিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। এ সাধারণ আত্মহত্যা নয়। নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব রক্ষা করতে আত্মহত্যা। তাঁরা জানেন, সম্রাট বাদশার লেলিহান লোভানলের থেকে, শত্রুর কাছে দাসীবৃত্তি করার চেয়ে প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ। সেজন্য সমস্ত রাজপুত মহিলা সমস্বরে বলেন;—

"জ্বল, জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান ।
দেখ্ রে যবন, দেখ্ রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক -ফাঁসি,
জ্বলন্ত- অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।" (৯২)

—এখানে ভারতীয় নারীর বড় অপমান সতীত্ব নাশ ও দেশের কলঙ্ক দাসীবৃত্তিকে রাজপুত মহিলারা উপেক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বাদশা আল্লাউদ্দিন বলতে বাধ্য হয়েছে;—"আশ্চর্য! আশ্চর্য! ধন্য হিন্দুমহিলাদের সতীত্ব! হায়! এত কষ্ট করে যে জয়লাভ কল্লেম তা সকলই নিষ্ফল হল।"(৯৩) ভারতীয় নারীর সতীত্ব বা দেহ ও মনের পবিত্রতাটি স্বয়ং বাদশা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

'সরোজিনী' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। রাজা লক্ষ্মণসিংহ একাধারে পিতা ও রাজা। একদিকে সন্তানের জীবন রক্ষা অন্যদিকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা,—এই দুই-এর দ্বন্দ্বে লক্ষ্মণ সিংহ ক্ষতবিক্ষত। তিনি বোঝেন — দেশ রক্ষার মতো বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি সক্রিয়ভাবে কিছুই করতে পারেন নি। লক্ষ্মণ সিংহের এই দ্বন্দ্ব নাটকটিকে সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। তবুও বলা যায়, লক্ষ্মণসিংহ দেশহিতৈষী। কেননা, তাঁর মন যদি ব্যক্তিস্বার্থকে বজায় রাখতে চাইত, তাহলে দেশের স্বার্থকে সহজেই জলাঞ্জলি দিতেন। তাছাড়া লক্ষ্মণসিংহ তখন বিভ্রান্ত। তাঁকে যেভাবে চালিত করা হত তিনি সেভাবেই চলতেন। দেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ ছিল বলেই তিনি স্বাভাবিক থাকতে পারেন নি।

রণধীর সিংহ লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি। আল্লাউদ্দিনের আসন্ন আক্রমণ থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য নিয়ত চিন্তাশীল। দৈববাণীকে বিশ্বাস করে দেবীকে তুষ্ট করতে তিনি ফুলের মত সরোজিনীকে বলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসিংহ কন্যাস্নেহে কাতর হলে রণধীর বলেছেন;—"আমি মানলেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্তব্য। কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্তব্য ?" [৯৪] রণধীরের কাছে সন্তানের চেয়ে দেশ বড়। অবশ্য দৈববাণী মিথ্যা—পরবর্তীকালে একথা জেনে রণধীর আক্ষেপ করেছেন;—"আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস করে কেবল স্বদেশের মঙ্গলকামনায় ও কর্তব্যবোধে এতদূর পর্যন্ত করেছিলেম," [৯৫] —এখানে রণধীর চরিত্রে দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

বিজয় সিংহ সাহসী ও বীর। দৈবানুগ্রহের চেয়ে বাস্তব কর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ। বিজয়সিংহ বীরের মতো নিজের উপর আস্থা রেখে বলেছেন;—

> "মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষো করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্যই সিদ্ধ হয় না। ...মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা-কর্ত্র সত্য, কিন্তু মহারাজ! কীর্তিলাভ আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। ...ভৈরবাচার্যের দৈববাণী যাই হউক — না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।" [৯৬]

এইসব বক্তব্যে বিজয় সিংহ যে নিজের উপর আস্থাবান, তা জানা যায়। বিজয় সিংহ বীর, সাহসী ও নিজের উপর আস্থাবান, সঙ্গে অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক। তাঁর ভাষায়;—"মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" [৯৭]

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজিনী । মিথ্যা দৈববাণীর জন্য তার জীবন সংকটাপন্ন । লক্ষ্মণসিংহ কন্যাস্নেহে দৈববাণী পালনে সংকুচিত । সরোজিনী পিতার এরূপ অবস্থায় বলে ;—"পিতঃ! আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হচ্ছেন ? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবন-হস্ত হতে নিস্তার পায় তা হলেই আমার এই জীবন সার্থক হবে ।[৯৮] কিংবা সরোজিনী আরো বলেছে;—

> "পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হচ্ছেন ? আমার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না । এ কথা যেন কেউ না বলতে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হল; বাপ্পা রাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হল;"[৯৯]

সরোজিনীর উল্লিখিত মন্তব্যে প্রাণ রক্ষার মতো সামান্য স্বার্থের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা রক্ষা, বংশমর্যাদা প্রভৃতি বড় হয়ে উঠেছে ।

'অশ্রুমতী' (৪ঠা নভেম্বর ১৮৭৯) মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার নাটক। স্বাধীনতা নামক রত্নটি হাজারো প্রতিকূল-পরিস্থিতিতে যে হারানোর নয়, জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে তাকে আগলে রাখতে হয়, তা প্রতাপসিংহের ক্রিয়াকলাপে স্পষ্ট। মহারাণা চিতোরের পরাধীনতার জন্য গভীরভাবে ব্যথিত। তাঁর ভাষায়;—"সে চিতোর এখন বিধবা—স্বাধীনতার জন্মভূমি— বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা!"[১০০] —এখানে মহারাণা স্বাধীনতাকে চিতোরের পতি বা স্বামী বলে মনে করেন । তিনি রাজপুতদের উদ্দেশ্যে বলেন;—

> "রাজপুতগণ, তরবাল হস্তে এসো আমরা সকলে শপথ করি— যতদিন না চিতোরের অন্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি—ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস— সামগ্রী ব্যবহার করব না—রজত ও কাঞ্চন পাত্র— সকল দূরে নিক্ষেপ করে তার পরিবর্তে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করব—আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুরস্পর্শ করব না—আর শুষ্ক তৃণশয্যায় আমরা শয়ন করব।"[১০১]

—ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকলে জাতির পরাধীনতার কলঙ্ক ঘোচানো সম্ভব নয়; তাছাড়া এই ভোগবিলাসই সমস্ত অমঙ্গলের মূল। প্রতাপসিংহ বলেন;-"বিশেষত বিলাসই আমাদের সর্বনাশের মূল— বিলাসেই আমরা উৎসন্নে যাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই উচিত।"[১০২] প্রতাপ সিংহের এজাতীয় মূল্যায়ন যথেষ্ট যুক্তিসম্মত। বিলাসবহুল জীবনাচরণ সুগভীর ভাবনা বা সৃষ্টিশীল মনোভাবের পরিপন্থী । মহারাণার কাছে স্বাধীনতা ভিন্ন সবই মিথ্যা । তিনি স্ত্রীকে বলেন;—"...মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলংকার ধন ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর— কিন্তু তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ— স্বাধীনতাই—"[১০৩]

স্বদেশীয়দের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে শত্রুর দাসত্বকে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রতাপ সম্পর্ক রাখেন না। সেজন্য প্রতাপসিংহ মুঘলের অধীন মানসিংহকে স্বজাতীয় বীর বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন নি। প্রতাপসিংহ সদর্পে বলেন;—"...যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন— কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তাঁর সহিত সূর্যবংশীয় রাণা একত্র কখনোই আহার-স্থানে উপবেশন করতে পারে না।" (১০৪) মানসিংহ বোঝানোর চেষ্টা করেন মুঘলের বিরোধিতা করার অর্থ চরম ক্ষতিকে ডেকে আনা। প্রতাপসিংহ তার উত্তরে বলেন;—

> "দেখুন মহারাজ মানসিংহ, আমি বরঞ্চ পর্বতে পর্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপদকে অসংকোচে আলিঙ্গন করব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য করব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনোই স্বীকার করব না।" (১০৫)

স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতাপসিংহ শুধু কথায় নয়, সর্বস্বহারা হয়েও পরাধীন হতে চান নি। এমন কি মৃত্যুশয্যায় এই একটি মাত্র চিন্তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। মন্ত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন;—"আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমর্পিত হবে না—এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনও বেরোতে বিলম্ব কচ্ছে।" (১০৬)

মধ্যযুগের ইতিহাসে স্বদেশীয় রাজার মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার কঠোর সংগ্রাম নাটকটিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলক নাটকের মর্যাদা এনে দিতে পারে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবুও উনিশ শতকে রচিত এই নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচনার সংবাদ পাওয়া যায়। নাট্যকাহিনীতে আছে প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী বাদশা-পুত্র সেলিমকে ভালোবেসেছিল। সেলিমকে নিয়ে অশ্রুমতী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। যে প্রতাপসিংহ মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকারী মুঘলকে চরম শত্রু মনে করতেন, এমনকি মুঘলের নিকট যাঁরা দাসত্ব স্বীকার করেছে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, সেই মুঘলবাদশাপুত্র সেলিমকে তাঁরই কন্যা অশ্রুমতী ভালোবেসেছে। এই সম্পর্ক প্রতাপসিংহের নিকট ঘৃণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক দর্শক ও পাঠকের নিকট বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। অবশ্য নাট্যকার এর উত্তরে বলেন;—

> "কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কোন কন্যা ছিল কি না এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই কোন প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন —

রাণা প্রতাপসিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন খণির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয় । এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত ।" (১০৭)

— আসলে আমরা যদি 'অশ্রুমতী'কে একটি সাহিত্য গ্রন্থ হিসাবে দেখি, তাহলে সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেমের চিত্রে কোন অসঙ্গতি পাওয়া যাবে না। কারণ অশ্রুমতী চরিত্রহীনা নয়, সে জানে না মুসলমান হিন্দুর স্বাধীনতা হরণকারী শত্রু । সেই হিসাবে নাটকটি সাহিত্যের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি । তাছাড়া সেলিম-অশ্রুমতী প্রেমে কোনরকম লালসা এসে অপবিত্র করেনি । তবুও এই সংবাদ প্রতাপসিংহের কাছে কলঙ্কের নামান্তর । সেজন্য তিনি অশ্রুমতীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ করেন । তিনি বলেন;—"অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনীব্রতে দীক্ষিত করো—চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে, তাও অপনীত হবে" (১০৮)

বলা যায় 'অশ্রুমতী' পাঠক ও দর্শককে একাধারে দেশানুরাগী হওয়ার প্রেরণা দান ও সাহিত্যরস দানের একটি বিখ্যাত নাটক।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি ঐতিহাসিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' (২৪শে মার্চ, ১৮৮২)। নাটকটিতে শুভসিংহের বিদ্রোহের কাহিনী আছে । এই বিদ্রোহ হল মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ। যদিও নাটকে শুভসিংহের বিদ্রোহে ছলনা বা কৌশলের পরিচয় আছে । শুভসিংহ ছদ্মবেশে, মিথ্যার আশ্রয়ে, মানুষকে ভুলপথে চালিত করে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন । সুরজ শুভসিংহকে বলেন;—

"—প্রতারণাটা যে বড়ো ভালো কাজ তা আমি বলছি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর—কোনো উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন— মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়—তা না করলে চলে কই ?" (১০৯)

শুভসিংহ প্রতারণা করতে গিয়ে বিবেক দংশনগ্রস্ত হতেন। সমস্ত প্রতারণার কথা প্রকাশ করতে চাইতেন; কিন্তু তাতে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এই ভয়ে ও বিশ্বাসে পুনরায় প্রতারণার আশ্রয় নিতেন। তাঁর ভাষায়;—"মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে ? আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন করে তোমাকে যদি হীনতা হতে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি কেন তা না করব ?" (১১০)(পৃঃ ১৮৩, স্বপ্নময়ী, ঐ)

ছদ্মবেশী শুভসিংহ স্বপ্নময়ীকে দেশজননীর পরাধীনতার যন্ত্রণার কথা বলেন। —যা একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কথা । তিনি স্বপ্নময়ীকে বোঝাতে চান দেশজননীই হল প্রকৃত জননী । তাঁর ভাষায়;—

"অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।" (১১১)

জন্মভূমি পরাধীন, অপমানিত ও নিঃস্ব। একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের নিকট এটা একাধারে লজ্জা ও অপমান। নাটকে স্বদেশের দুরবস্থার বিষয়ে বলা হয়েছে ;—

"...দেবমন্দির সকল

চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে

বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ—

গো হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—

অপমান নয় ? অপমান বলে কারে?" (১১২)

শুভসিংহের এইসব বক্তব্য এক অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের মনের কথা। যদিও শুভসিংহ দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অন্তরের দেশানুরাগের আবেদন দর্শক ও পাঠকের মনকে অনুপ্রাণিত করে ।

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় রচিত আর্থ-রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ একাধিক নাটক রচিত হয়েছিল। এখানে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ও উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭১) এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের আলোচনা করা হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণের এক বাস্তব চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবের শোষণের মাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে, গ্রামের কৃষকের জীবনধারণ দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। নীলকর সাহেবের অত্যাচারে ধন-সম্পত্তি, ভিটে-মাটি এমনকি পল্লীবাংলার অন্তঃপুরের নারীর সম্মান রক্ষা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এবিষয়ে 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ'-গ্রন্থে অধ্যাপক স্বপন বসু বিবিধার্থ সংগ্রহে 'নীলদর্পণ'-এর সমালোচনার উল্লেখ করেন। যথা;—

> "নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে রামচন্দ ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণহৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বাপহরণ করেন; কিরূপে প্রজার চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীলাহল কর্ষিত হয়; কিরূপে পিতা-মাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার উদ্যানের অনুত্তম সুবর্ণ পুষ্পস্বরূপ, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক, নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ হইয়াছে, কিপ্রকারে কত অচতুরা

গৃহস্থবালা নীলকরহস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কিপ্রকারে নীলকরগণ অম্লানবদনে আবালবৃদ্ধবনিতা পরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকেন; নীলকরদিগের কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক ও নীল কৃষিকার্য্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহা সম্যকরূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য।" (১১৩)

দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরের অত্যাচারে বিপন্ন দেশীয় মানুষের কথা বলেছেন। নাটকের সূচনায় নীলকরের অমানবিক অত্যাচারের প্রসঙ্গে প্রতিবেশী সাধুচরণ গোলকনাথ বসুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে;— "আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে।" (১১৪)

'নীলদর্পণ' বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এর ভূমিকায় সে উদ্দেশ্যের কথা অকপটে স্বীকার করেন। নাট্যকারের ভাষায়;—

"নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।"(১১৫)

দীনবন্ধু মিত্র চেয়েছিলেন, এদেশের অসহায় কৃষক সমাজের মুক্তি। সেজন্য তিনি নীলকরের অত্যাচারকে 'নীলদর্পণ' নাটকে কাহিনী করেছেন। সে কাহিনীকে তিনি দর্পণ বলতে চেয়েছেন। দর্পণ যেমন মূলের ছবি তেমনি নীলকরের অমানবিকতার দর্পণ 'নীলদর্পণ'। অর্থাৎ এদেশের নীলকর ও নীলচাষীর বাস্তব চিত্র 'নীলদর্পণ'। এই 'নীলদর্পণ'-এ নীলকরের অমানবিক স্বার্থপরতার চিত্র ধরা পড়েছে। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আশা করেছেন, নীলকর তাদের অমানবিক চরিত্র দর্শন করে দেশীয় কৃষকের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে। সেজন্য তিনি নাটকের 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে—তাহলে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার পরিশ্রম সার্থক হবে। এতে দীনবন্ধু মিত্রের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপেন্দ্রনাথ দাস ওরফে দুর্গাদাস দাস (১২৫৫-১৩০২) বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তি। উপেন্দ্রনাথ দাস বলতেই মনে পড়ে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর (১৮৭৬) কথা। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয় সরকার বিরোধী নাট্য রচনা নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাহলে আমাদের মনে হতে পারে, উপেন্দ্রনাথ সরকার বিরোধী বা রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সে অর্থে রাজনৈতিক নাটক বলা যাবে না। এপ্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন;—

"পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী-সমাজ লইয়া তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন, সেজন্য একটা স্বতন্ত্র, সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে যে একটু আড়ষ্ট ও অসামাজিক বোধ হয় তাহাও সত্য। শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে যে তৎকালে ইংরাজবিদ্বেষী ও স্বদেশহিতৈষী স্বদেশগর্বী ভাব জাগ্রত হইয়াছিল নাট্যকার নাটকে তাহার অবতারণা করিলেন।...'শরৎ সরোজিনী'র কথাই ধরা যাক। এক ইংরাজ সার্জনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শরৎ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় হয়তো দিয়াছে, অথবা কয়েকটি গোরা ডাকাতকে নিপাত করিয়াছে, কিন্তু সেই জন্যই এই কর্মগুলিকে উচ্চধরণের জাতীয়তার অঙ্গ বলা যায় না। সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও জাতীয় ভাবের অনুকূল পরিবেশ নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে তরল জাতীয়তার বহ্বাস্ফোট থাকিলেও ইহাকে জাতীয় ভাবোদ্দীপিত নাটক বলা চলে না।" (১১৬)

তবে নাটকে জাত্যাভিমানী ইংরেজ চরিত্রের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে—তা স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিকে আহত করে। 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের একাধিক স্থানে জাত্যাভিমানী ইংরেজ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এবিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সুকুমার সেন 'শরৎ সরোজিনী'র কাহিনী বলতে গিয়ে লিখেছেন;—

"...মতিলাল ডাকাত পাঠাইয়া সুকুমারীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিল। দুইটা পিস্তল লইয়া শরৎ দেশি ডাকাতদের হঠাইয়া দিল এবং একজন গোরা ডাকাতকে মারিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় গোরা শরৎকে কাবু করিলে পর সরোজিনী শরতের হস্তভ্রষ্ট পিস্তল কুড়াইয়া লইল এবং "আর আমি থাকতে পারি নে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু অনাথের নাথ আমার সহায়! ইংরাজরাক্ষসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এ ভিন্ন উপায় নাই", বলিয়া "উল্লিখিত ক্ষুদ্র পিস্তলদ্বারা গুলি করিয়া দ্বিতীয় গোরাকে শমনসদনে প্রেরণ" করিল।" (১১৭)

অনুরূপ বিষয় 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকেও রয়েছে। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অন্যতম চরিত্র ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল। ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবের মনোভাব শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিকে আহত করে। এদেশ যে পরাধীন সে কথা ম্যাক্রেণ্ডেলের মতো জাত্যাভিমানী বিদেশী সাহেব পরোক্ষে মনে করিয়ে দেয়। ম্যাক্রেণ্ডেল সুরেন্দ্রকে বলেছিল;—

"নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমার দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।" (১১৮)

সেকালে সাহেবকে দেখে সম্মান প্রদর্শন করা একটি রীতি ছিল। সুরেন্দ্র ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবকে দেখলেও সৌজন্যমূলক সম্মান জানায় নি। তাতে সাহেব রেগে গিয়ে কৃষ্ণদাসকে বলেছিল;—

> "এ সকল সাধারণ উদ্যানে অর্ধসভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রবেশ নিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। —আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না।" (১১৯)

বলাবাহুল্য, 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' ও 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের উল্লিখিত বক্তব্য যে কোন স্বদেশ প্রাণ ব্যক্তির মনে বিজাতীয় ঘৃণা জাগিয়ে তুলবে।

নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বাঙালী ঃ

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের একাধিক নতুন প্রকরণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল । উপন্যাস ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধের মতো বাংলা নাটকও উনিশ শতকেই রচিত হয় । শুধু নাটকই নয় উনিশ শতকেই বাঙালী সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা নাটক রচনা করার এক সফল উদ্যোগ চোখে পড়ে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ নামক জনৈক রুশ দেশীয় ব্যক্তি 'কাল্পনিকসংবদল' (১৭৯৫) নামক একটি অনুবাদমূলক নাটকের অভিনয় করান। এরপর দীর্ঘদিন বাংলায় নাটক রচনা বা অনুবাদ ও অভিনয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নাটক অভিনয়ের জন্য হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) নামে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর পরে নবীন বসু তাঁর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় (১৮৩৫) করান। এরপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার জোয়ার আসে । জি. সি. গুপ্ত , তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেন । ট্র্যাজিক রস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র, নাটকের মূল ধর্ম দ্বন্দ্বময়তা, আর্থ-সামাজিক -ঐতিহাসিক ঘটনার মতো অভিনব দিকগুলি বাংলা নাট্য সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল । কিন্তু এতসব সমৃদ্ধি আসার পরেও যেন বাংলা নাটক সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নাটক হয় নি । এখন প্রশ্ন হতে পারে,—উল্লিখিত নাট্যকারের রচনায় এমন কিসের অভাব ছিল যাতে বাঙালী-আত্মার সুর ধ্বনিত হয় নি ? এর উত্তর হল, খাঁটি বাঙ্গালিয়ানার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রয়োজন অনুভব করে বলেছিলেন;—

> "প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন । সামগ্রীটা কি এ ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা

কা ফুল" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি।...আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।"(১২০)

—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী হিসাবে খাঁটি বাংলা কথা শুনতে চেয়েছেন, —যা একান্ত বাঙালীর নিজস্ব। বাঙালীর এই নিজস্বতা ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন;—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম।...মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন করি । ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস্ ভবভূতিও অনেক দূরে ।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম । এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল । জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে ।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী- জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবি - জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম । তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবি, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল — এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়— হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের— আমাদের নহে।"(১২১)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির নিকট জানা গেল— ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর ভাষা-সংস্কৃতির মিল নেই। এমন কি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী কবির কবিতাতেও তিনি খাঁটি বাঙালিয়ানা খুঁজে পান নি । আর সে জন্য শিক্ষিত বাঙালী কবির কবিতা তাঁকে তৃপ্তি দেয় নি। তৃপ্তি দিয়েছিল নদীবক্ষে জনৈক বাঙালী জেলের গান । এই গানটি কিন্তু কারো সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই । এ গান—একান্ত বাঙালীর নিজের গান। বাঙালীর নিজস্ব গানই বঙ্কিমকে শান্তি দিয়েছিল। আমাদের বাংলা নাটক সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারি। জি. সি. গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারের রচিত নাটকে খাঁটি বাঙালিয়ানা খুঁজে পাওয়া

মুসকিল। এঁদের রচনায় কখনো পাশ্চাত্যের অনুকরণ, কখনো সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ। বাঙালীর নিজস্বতা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ অভাব বলতে খাঁটি বাঙালী মনস্কতার অভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করব, উনিশ শতকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের উক্ত খাঁটি বাঙালিয়ানার অভাব পুরণে অনেক নাট্যকার এগিয়ে এসেছেন। এখানে নাট্যসাহিত্যের সেই খাঁটি বাঙালিয়ানার অনুসন্ধান করা হবে ।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির দ্বারা শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর কথা বলা যায় । ভারতবাসী হলেও বহুদিন ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালী নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে । যেমন বাল্মীকির রামকে বাঙালী কবি কৃত্তিবাস সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালীর রাম করে নিয়েছেন । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "মূল রামায়ণের বীর রামচরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন, ক্ষত্রিয়বধূ সীতা হয়েছেন সর্বংসহা বাঙালী কুলবধূ, হনুমানের রঙ্গরস প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতিরই পরিচায়ক । এক কথায় কৃত্তিবাস মূল রামায়ণকে অনেকটা বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির অনুকূলে সাজিয়েছেন—তাই তাঁর গ্রন্থ বাঙালীর জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে ।" (১২২)

অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঙালী একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের করে নিয়েছে। আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির তো কোন মিলই নেই। বাংলা নাটক রচনার প্রথম দিকে, বাঙালীর নিজস্ব নাটকের অভাব হেতু পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক অনুবাদিত ও রচিত হয়েছে। এই সময়ের বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির আদর্শ, পঞ্চমাঙ্ক, গর্ভাঙ্কহীন অঙ্ক, নটনটী, সূত্রধার, কখনো সঙ্গীতের ব্যবহার, কাহিনী হিসাবে আর্থ-সমাজ-ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-রাজনৈতিক বিষয় বাংলা নাটককে যথেষ্ট আস্বাদনীয় করে তুলেছে । কিন্তু এর মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব প্রাণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় না। ফলে অনেক বাঙালী নাট্যকার নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ বাংলা নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রে নিজস্বতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন ।

আমরা পুর্বেই উল্লেখ করেছি , প্রথম দিকে বাঙালী নাট্যকার নাটক নামক সাহিত্য প্রকরণটির ধারণা সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেন । ফলে নাটকের আকৃতি বা গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুকরণ করা হয়েছে । এইসব অনুকরণে কিন্তু বাঙালীর নিজস্বতা নেই । বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণ

সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধমত দিয়েছেন। 'অনুকরণ' প্রবন্ধে তিনি অনুকরণের পক্ষে বলেন;—"যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়;—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়," (১২৩) বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই কথাটি খাটে। প্রথম দিকে নাটকের অনুকরণ হচ্ছিল কিন্তু বাংলা নাটকের রচনায় অচিরেই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ছবি ফুটে উঠে। নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে অচিরে বাংলা নাটকে বাঙালী সংস্কৃতির অনুকূল সঙ্গীতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। মনোমোহন বসু সদর্পে ঘোষণা করলেন, গানছাড়া বাংলা নাটক বাঙালীর নাটক হয় না। গানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'সতী' নাটকের ভূমিকায় মনোমোহন বসু বলেন;—

> "ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিদ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইহা জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত স্বর সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গ অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রাতভিকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি ? (১২৪)

—বাংলা নাটককে বাঙালীর নিজস্ব নাটকে পরিণত করতে হলে সঙ্গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, মনোমোহনের অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা সেকথাই প্রমাণিত হয়েছে। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও বাংলা নাটকে সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন; বোঝেন না — অপর ভাষায় গানে নাটক — উপযোগী হৃদয় — ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-সুর-রচয়িতার কতদূর হৃদয়-হারিনী প্রভাব।" (১২৫)

গিরিশচন্দ্র ঘোষও সংগীতের অসম্ভব ক্ষমতার কথা স্বীকার করে বাংলা নাটকে সংগীতের ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে বাংলা নাটকে এক অভিনব নাট্যধারার প্রতিষ্ঠা হয়, তা হল গীতাভিনয়। গীতাভিনয় প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বলেন;—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নূতন যাত্রা শিক্ষিত জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ ইহার আঙ্গিকের কোন ত্রুটি নহে, ইহার রুচির বিকার। এদিকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সখের রঙ্গমঞ্চগুলিতে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হইতেছিল, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিয়া, কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিবার প্রয়োজনীয়তাও কেহ কেহ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে নাটকের রস পবিবেশন করিবার পক্ষে নূতন যাত্রার আঙ্গিকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, অতএব ইহারই এক উন্নত রূপের ভিতর দিয়া তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার ও নূতনযাত্রার গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হইল — সেইজন্য ইহার নামকরণ করা হইল গীতাভিনয়।"(১২৬)

অর্থাৎ দেশীয় নৃত্য গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নাটকীয় সংলাপের মিশ্রণের দ্বারা গীতাভিনয়কে বাঙালী নিজের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমরা পূর্বেই একবার কৃত্তিবাসের কথা বলেছি, মধ্যযুগে ঠিক কৃত্তিবাস যেমন করে বাল্মীকির রামায়ণকে সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালীর রামায়ণে পরিণত করেছিলেন; উনিশ শতকের নাট্যকার মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনেক নাটকের বিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। উনিশ শতকে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', 'সতী নাটক', 'হরিশচন্দ্র' প্রভৃতি, গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগমনী', 'মলিনা বিকাশ', 'আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদ্‌সাই', 'আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ' 'ফণির মণি', 'পারস্য প্রসূন বা পারিসানা', 'দেলদার', 'মায়াতরু' প্রভৃতি, রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা', ও 'মায়ার খেলা' উল্লেখযোগ্য গীতাভিনয়মূলক রচনা। এখানে লক্ষ করা গেল, বাঙালী নাটককে কিভাবে নিজের সংস্কৃতির অন্তর্গত করেছে।

এবার আলোচনা করা হবে, বাংলা নাটকের প্রকৃতি বিষয়ে। বাঙালী তার প্রকৃতি অনুযায়ী নাটককে কেমন করে পরিবর্তিত করল ? একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মনে করেন "ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম-ধর্ম্ম।" (১২৭) সেজন্য বাঙালী ধর্মের মধ্যেই আত্মার শান্তি পেয়েছে। উনিশ শতকের শেষে ধর্মের মঞ্চেই বাঙালী তার জীবনের যাবতীয় সমস্যা দেখতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে নাটকের পার্থক্য আছে। অভিনীত হলেই নাটক রচনা সার্থক বলে বিবেচিত হয়। অভিনয়ের জন্য প্রত্যক্ষ দর্শকের প্রয়োজন। দর্শক যতবেশী হবে নাটকের সাফল্য তত বেশী। অতএব নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার দর্শকের রুচির দিকটি খেয়াল রাখেন। এই সময়ে বাঙালী দর্শক মঞ্চে ধর্মকথা শুনতে ও অভিনয় দেখতে চাইতেন। বাস্তব জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

বহু বিচিত্র দ্বন্দ্ব পরিহার করে ধর্মীয় নাটক রচনা ও অভিনয়ের বাহুল্য চোখে পড়ার মতো। এতে অবশ্য যুগবিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে একথা মানতেই হয়, পৌরাণিক বা ধর্মীয় নাটকে এমন একটি শক্তি আছে যা যুগবিমুখ হয়ে বাঁচার বিকল্প রসদ যোগান দিয়েছিল। প্রশ্ন হতে পারে, এমন কি রসদ ছিল ? আমরা লক্ষ করব—ধর্মমূলক নাটকে বাঙালী এক পরম প্রশান্তি পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন —

> "দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজী ভানে, বিদেশীয় ভানে যাহারা সেই ভান করেন (তাঁহারা সেই ভানের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না।" (১২৮)

অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে বাঙালী জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই অবিচ্ছেদ্য জীবন মঞ্চে অভিনীত হলে স্বভাবতই জনপ্রিয় হবে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনিশ শতকের শেষে রচিত ধর্মমূলক নাটকে বাঙালী ভারতবাসী হয়েও নিজস্বতার ছাপ রেখেছে। বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্ব থেকে পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটকে ভক্তি রসের বাহুল্য নিতান্তই কম ছিল। ভক্তি রসের অপ্রতুলতার জন্য আপামর বাঙালী তা সাদরে গ্রহণ করতে পারে নি। উনিশ শতকের শেষে ভক্তিরসে সমৃদ্ধ নাটকই বাঙালীকে নাট্যরসে তৃপ্ত করেছিল। তাছাড়া নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রেও বাঙালীর নিজস্ব ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচিত হয়েছিল। যেমন;—মঙ্গলকাব্য থেকে 'কমলেকামিনী', গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের থেকে 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী।

উনিশ শতকে সচেতন বাঙালী শাসক-শাসিতের পারস্পরিক বৈষম্যের সম্পর্ককে সহজেই অনুভব করেছিলেন। জাতীয় বঞ্চনার বিষয়টিতে সচেতন বাঙালী আহত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একদিন শ্রেষ্ঠ ছিল। নাট্যকার প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সোনালী দিনগুলি আমাদের পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেন। নাট্যকার তাঁর নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য, নারীর মহৎ গুণাবলী পুরাণে খুঁজে পান। উনিশ শতকের বাঙালী সমকালের দুরবস্থার মধ্যেও পুরাণের গৌরবময় বীরত্ব, শৌর্য, মহত্বের মধ্যে শান্তি পেতেন। বাঙালী যুগবিমুখ হয়েও সমকালের জাতির দুরবস্থাকে কিন্তু ভুলতে পারে নি। তা পৌরাণিক নাটক রচনার দ্বারা পরোক্ষে প্রমাণিত। তাছাড়া যুগের সমস্যাকে কাহিনী না করে পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচনে বাঙালীর একটি প্রতিবাদী মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রতিবাদ যেন সমকালের বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীরবে প্রতিবাদ। এ একপ্রকার নবজাতীয়তাবাদ বললে অত্যুক্তি হবে না।

আর একটি কারণের কথা উল্লেখ করতে হবে; ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্ট' চালু হওয়ায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শাসক বিরোধী নাটক লেখা নিষিদ্ধ হয়। ফলে বাঙালী নাট্যকার বাধ্য হয়েই 'শরৎসরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'র মতো নাটক রচনা ত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ যদিও বা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক কিছু নাটক রচিত হত, এই আইনের বলে সে সুযোগ রইল না। ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ধর্মীয় বা পৌরাণিক নাটক একচ্ছত্র প্রাধান্য পেল।

উনিশ শতকে ধর্মীয় তথা ভক্তিমূলক বা পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বাধিক সফল নাট্যকার। এখানে এইজাতীয় নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার অনুসন্ধান করা যেতে পারে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যের নিকট এক যুগান্তকারী ঘটনা । স্বনামধন্য নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেলাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।"(১২৯)

উনিশ শতকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা করলে স্বনামধন্য নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নিতেই হবে। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটক রচনার দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রতিভায় মুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসংখ্য নাটক লিখেছেন। যথা;— 'আগমনী', 'অকালবোধন', 'মায়াতরু', 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'নল-দময়ন্তী', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বিল্বমঙ্গ লঠাকুর', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'জনা', 'কালাপাহাড়', 'পান্ডব গৌরব', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি। শুধু তাই নয়— গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক হিসাবেও অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক লিখতেন । সেজন্য নাটককে কিভাবে আরো জনপ্রিয় করা যায়— সেবিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল । নাট্যকার হিসাবে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন—বাংলা নাটককে বাঙালী রুচির অনুকূল করলে নাটক জনপ্রিয় হবেই । তিনি শারদীয়া উৎসবে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রথম নাটক রচনা করেন 'আগমনী' (গ্রন্থপ্রকাশ - ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) তারপর 'অকালবোধন' । এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকার দেশানুরাগমূলক নাটক লিখে বেশ জনপ্রিয়

হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার হিসাবে দেশানুরাগমূলক নাটক লিখে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বরং তিনি বাংলা নাট্যক্ষেত্রে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাটকের জোয়ার নিয়ে আসেন । শুধু নাটকের বিষয়ের দিক থেকে নয়, বাংলা নাটককে বাঙালীর নিজস্ব নাটক হিসাবে তুলে ধরার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না । তিনি বলেন;—"দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যতপ্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না । ...হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম । মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।" (১৩০) 'নাট্যকার' নামক প্রবন্ধে তিনি নাটককে জাতীয় ভাবের অনুগামী হবার কথা বলেন । তাঁর ভাষায়;—

> "যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব- শোভা, দেশীয় নায়ক- নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত— তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।" (১৩১)

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সামাজিক নাটক বা দেশানুরাগ মূলক ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষপাতী ছিলেন কি না। এ বিষয়ে তিনি 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে বলেন—ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালীর টান ক্ষীণ, পাশাপাশি বঙ্গ সমাজে নিজস্ব বিচিত্রতার অভাব । সেজন্য বাংলায় ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক নাটক রচনার চেয়ে ধর্মীয় নাটক বেশী জনপ্রিয়। ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গে বলেন;—"...যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ...আমরা এক্‌জামিনের খাতিরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি;" (১৩২) আবার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য;— "দোষ - গুণ লইয়া নাটক রচিত হয় । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই।" (১৩৩) পাশাপাশি তিনি পৌরাণিক গ্রন্থের সার্বজনীনতার বিষয়ে বলেন; —

> "যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ, কলম ও ছাপাইবার খরচ লইয়া সমালোচনা করেন। মনুষ্য- জীবনের দায়িত্ব তিনি বুঝেন নাই।" (১৩৪)

মনে হবে, উনিশ শতকের মতো আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র উদার মানব ধর্ম ত্যাগ করে বাঙালীকে দৈবানুগ্রহের অন্ধ-বিশ্বাসের রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। যদি তাই হয়, তাহলে মানতেই হবে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙালী সমাজের জন্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বয়ং নাট্যকারের স্বীকৃতি এ প্রসঙ্গে

স্মরণীয়। 'নটের আবেদন' প্রবন্ধে তিনি তাঁর অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ করে বলেছেন;—

> "আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা— কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি- মার্জ্জিত করিব—তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দেন।" (১৩৫)

এখানে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নের অকৃত্রিম ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাও সমান উজ্জ্বল। আমরা জানি— ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা মানুষকে পাশবিক জীবনাচরণ থেকে মুক্তি দেয়। অতএব বলা যায় গিরিশচন্দ্র সমাজের পাশবিক মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য তাঁর নাটককে ব্যবহার করেছেন। এ তো নাট্যসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে একপ্রকার সমাজ সংস্কার। এরপরেও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি — এমন অভিযোগ ঠিক নয় । আসলে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়ে বাঙালীকে নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বস্তরের বাঙালীর নাট্যানুরাগ সৃষ্টি করা। সেজন্য তিনি সমকালীন বাঙালী রুচির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন — বাঙালী রুচি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক । বিশেষত উনিশ শতকের শেষভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবে এই প্রবণতা ব্যাপক আকার নেয় । সেজন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক তথা ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক নাটক রচনার উপর জোর দিয়েছিলেন ।

গিরিশচন্দ্র গঠনগত ও প্রকৃতিগত উভয়ক্ষেত্রে বাঙালী রুচির অনুকূল নাটক লিখেছেন । যেমন 'মলিনা বিকাশ' 'ফণির মণি' ইত্যাদি অসংখ্য গীতিনাট্য লেখেন । আসলে তিনি মনে করেছিলেন গীতিনাট্য বাঙালীর নিকট যথেষ্ট আদরণীয় হবে। আবার পৌরাণিক নাটককে বাঙালীর কাছে আরো জনপ্রিয় করতে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পৌরাণিক বিষয়কে নাট্যরূপ দেন । এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন;—

"গিরিশচন্দ্র ছিলেন যথার্থই বাংলার জাতীয় নাট্যকার । তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া বাংলারই পুরাণ কথা প্রচার করিয়াছেন। বাংলা দেশে চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করিতে যায় নাই। সেইজন্য বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাস, বেদব্যাসের পরিবর্তে কাশীরামদাস, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্রই তাঁহার অবলম্বন ছিল । বাংলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির উপর এত সুগভীর মমতা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।" (১৩৬)

আমরা এই অধ্যায়ে লক্ষ করলাম—উনিশ শতকেই বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই নতুন সাহিত্য প্রকরণ শুধু বিলাসী সাহিত্য প্রকরণ হয়েই থাকে নি। এই পর্বের নাটক সমকালের সমাজ

সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা নাটক উনিশ শতকেই রচিত হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই দায়িত্ব বোধকে আমরা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা বলে অভিহিত করতে পারি।

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, সংশোধিত ও পরিবর্তিতত অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, পৃ: ৪।

২। বিজ্ঞাপন, ভদ্রার্জুন, হারানো দিনের নাটক — সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২১।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৫। ভূমিকা, কীর্তিবিলাস, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ৫৮।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

৮। বিজ্ঞাপন, কুলীনকুল সর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ১৫১।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১।

১০। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, বেণীসংহার, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২৩৫।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৫।

১২। বিজ্ঞাপন, রত্নাবলী, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২৮৩।

১৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫ পৃ: ১৫৩-১৫৪।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬০।

১৫। মঙ্গলাচরণ, শর্মিষ্ঠা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ঊনপঞ্চাশ।

১৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫ , পৃ: ১৭২।

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড — ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১১৬-১১৭।

১৮। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৯৭।

১৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩০৫।

২০। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৩২।

২১। কুলীনকুলসর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ১৫৭।

২২। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩১২-৩১৩।

২৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৬১।

২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১২৩।

২৫। সাহিত্য সাধক চরিমালা, ২য় খণ্ড — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৬২ ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ: ১৬৮।

২৬। উৎসর্গ পত্র, শাস্তি কি শাস্তি, গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ৪৯৭

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১৩০।

২৮। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২০৯

২৯। একেই কি বলে সভ্যতা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৪৭-২৪৮।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫১।

৩২। বুড় সালিকের ঘাড়ে, রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৫৫-২৫৬।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৪।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৯।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৯।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।

৩৭। বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১৪০।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪।

৩৯। সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১৯৯।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৮।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৮।

৪৩। জামাই বারিক, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ২৯৩-২৯৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৩।

৪৫। বিজ্ঞাপন, কুলীনকুল সর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ১৫১।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১।

৪৭। নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩৭।

৪৮। উপহার, নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩১।

৪৯। নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩২।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬৫।

৫১। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৩-৭৩৪।

৫২। নটের আবেদন, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয়

মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৭।

৫৩। প্রফুল্ল, গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৯১, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগষ্ট ১৯৯২, পৃ: ৪৮৩।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৯২।

৫৫। হারানিধি, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ২২২।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৮।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১০।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৭।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৯-২৩০।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৮।

৬৩। মায়াবসান, গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক — ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪. তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ৪৪৯।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩১।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১০-৪১১।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩০।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩২।

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৬।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১২।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৭।

৭২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৮।

৭৩। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিক যুগ)—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮৮ (আগষ্ট ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯, পৃ: ৪৯৯।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬৯।

৭৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৬৩।

৭৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩০২।

৭৭। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪,সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩০৬।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৬-৩০৭।

৭৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১১৭।

৮০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৪৩।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।

৮২। পুরুবিক্রম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১২।

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৮৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৯১। সরোজিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১০৪।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

১০০। অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১০৭।

১০১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৭।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০-১১১।

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

১০৭। কৈফিয়ৎ, অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: পঁয়ত্রিশ।

১০৮। অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১৬৮।

১০৯। স্বপ্নময়ী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১৭২।

১১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬।

১১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৫।

১১৩। নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচনা, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ১ম খণ্ড, সংকলিত ও সম্পাদিত-স্বপন বসু, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৯এপ্রিল ২০০০, প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলিকাতা-২০, পৃ: ৩২৫।

১১৪। নীলদর্পণ, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮জুন, ১৯৭৩, পৃ: ৩।

১১৫। ভূমিকা, নীলদর্পণ, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১।

১১৬। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, সংশোধিত ও পরিবর্তিতত অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, পৃ: ১৪৫।

১১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৩২৯।

১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩১।

১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩১।

১২০। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ ১৪১১, পৃ: ৭৬৩।

১২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬৩।

১২২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, নতুন সংস্কররণ, ১৯৯৫, পৃ: ৪২।

১২৩। অনুকরণ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ ১৪১১, পৃ: ১৭৭।

১২৪। ভূমিকা, 'সতী নাটক', বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৩৫১।

১২৫। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৪-৭৩৫।

১২৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৫৬।

১২৭। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩২।

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩২।

১২৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৪৯।

১৩০। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩২।

১৩১। নাট্যকার, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৪৭।

১৩২। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৩।

১৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৩।

১৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৩।

১৩৫। নটের আবেদন, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৭।

১৩৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৩৮০-৩৮১।